বাংলা সাহিত্যের কথা
শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা-ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষনকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাসাহিত্যের কথা

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

ভাষার কথা ... ১

সাহিত্যের লক্ষণ ... ১৪

সাহিত্যের উৎপত্তি ... ১৭

প্রাচীন যুগ

মনসামঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব ... ২১

মনসামঙ্গল-কাহিনী ... ২১

প্রাচীন কাব্যের ছন্দ ... ২৮

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব ... ৩০

চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী ... ৩১

কালকেতুর গল্প ... ৩১

ধনপতি সদাগরের গল্প ... ৩৯

ধর্মমঙ্গলকাব্যের তত্ত্ব ... ৪৫

ধর্মমঙ্গল-কাহিনী ... ৪৬

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ... ৫০

নাথসাহিত্য ... ৫১

গোরক্ষবিজয়-কাহিনী ... ৫১

ময়নামতীর গান ... ৫৫

লোকসাহিত্য

খেলার ছড়া ... ৬১

ছেলেভুলানো ছড়া ... ৬২

বিবিধ ... ৬৪

ডাক ও খনার বচন ... ৬৪

প্রবাদবচন ... ৬৭

ব্রতকথা ... ৬৮

গীতিকাব্য ... ৭০
অনুবাদসাহিত্য ... ৭৮
চরিতকাব্য ... ৭৮
নাটক ও যাত্রাভিনয় ... ৭৯
গদ্য ... ৮৩

আধুনিক যুগ

গদ্যরচনা ... ৮৭
পদ্যসাহিত্য ... ৮৯
যাত্রা, থিয়েটার ও অপেরা ... ৯৯
উপন্যাস ও গল্প ... ১০২
রঙ্গরচনা ... ১০৫
প্রবন্ধ ... ১০৬
শিশুসাহিত্য ... ১০৭
অনুবাদ-সাহিত্য ... ১০৮
বিবিধ ... ১০৯
রবীন্দ্রনাথ ... ১১৩
শরৎচন্দ্র ... ১১৪

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তকে আমাদের অল্পবয়স্ক-শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের জন্যে সরলভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে জটিল ও নীরস বোধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই এতে সে-ভাবে কালক্রমের অনুসরণ না করে শুধু বিষয়বস্তুর প্রতিই লক্ষ্য রেখেছি। বস্তুত এই বইখানিকে বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ-ইতিহাসের ভূমিকা স্বরূপেই ধরা যেতে পারে। এই পুস্তকপাঠে পাঠকের অন্তরে যদি বাংলাসাহিত্যের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে।

এই বইখানির সম্বন্ধে একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে, এখানির খসড়া অনেকদিন আগে কিছু কিছু করে লেখা হয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাঠভবনে উচ্চতর বর্গের ছাত্রদের তা থেকে পড়ানো হোত। পরে সেই খসড়াখানি সম্পূর্ণ-প্রায় হোলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দিই। তিনি সেখানিতে সংযোজন ও সংশোধন করে তার চেহারাই বদলে দেন। প্রকৃতপক্ষে বইখানি তাঁরই নির্দেশ অনুসারে লিখিত এবং অংশত তাঁরই রচিত। গুরুদেবের লিখিত অংশগুলি যথাসম্ভব উদ্ধরণ চিহ্ন দিয়ে ছাপানো হোলো।

অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকাদের কথা মনে রেখে এর বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। ইন্‌ফরমেশন হিসাবে বাংলাসাহিত্যের সব দিকের কথা কিছু কিছু করে তাদের জানানো উদ্দেশ্য। কাজেই এতে দু পাঁচজন বিখ্যাত লেখক আর কতকগুলি নাম-করা বইয়ের পরিচয় বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

বিশ্বভারতীর "রবীন্দ্র অধ্যাপক" শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানি দেখে জায়গায় জায়গায় অসংগতিগুলি ঠিক করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আর অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু, কানাই সামন্ত, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়গণ, এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সংস্করণে যদি কোথাও কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে তবে জানালে বিশেষ অনুগৃহীত হব।

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর
করকমলে
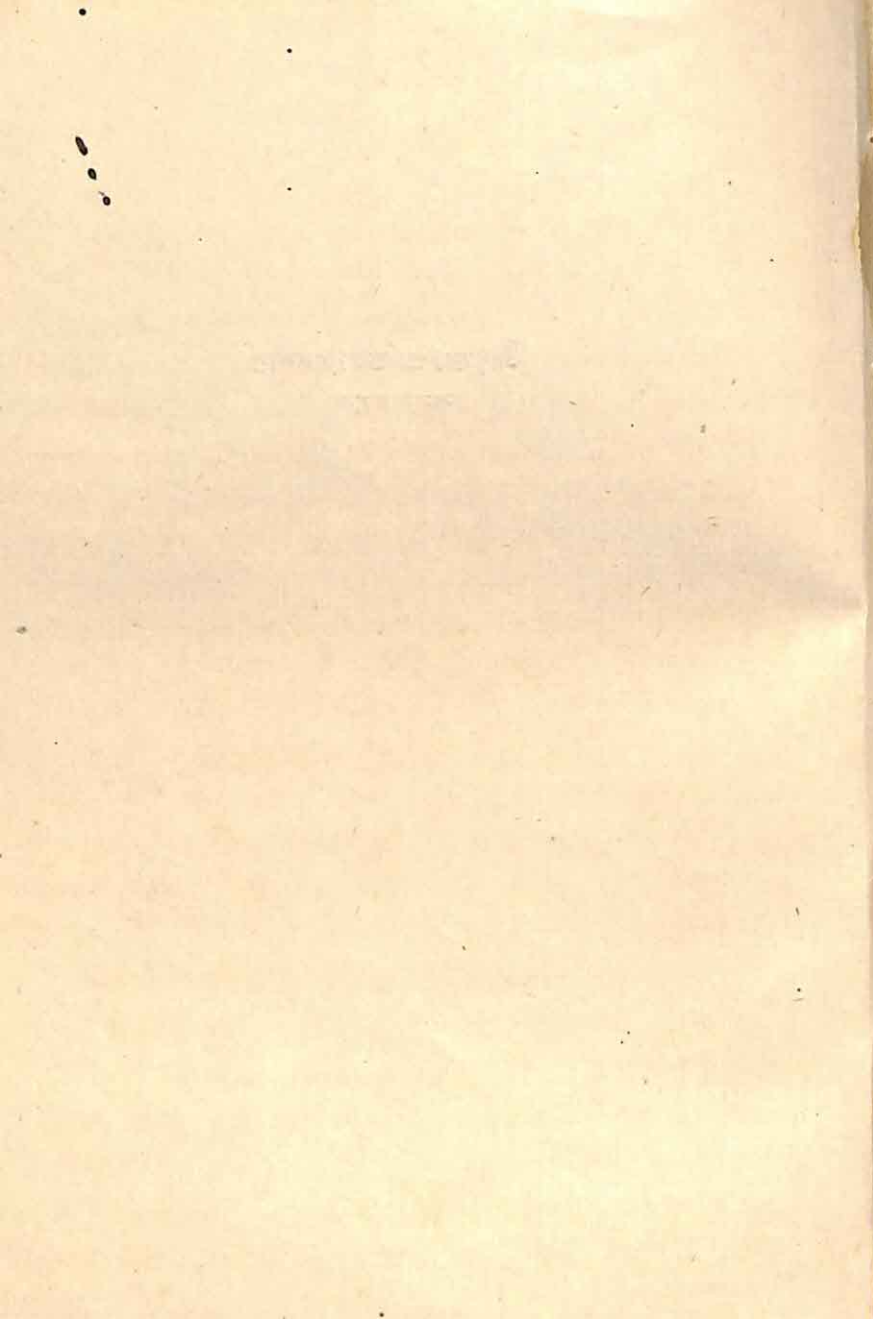
ভাষার কথা

"মানুষের জন্ম মায়ের কোলে। বছর তিন-চার তার আশ্রয় সেখানেই। ভাষা এবং বস্তু-জ্ঞানের ভূমিকা এই সময়ের মধ্যে প্রধানত তার মায়ের কাছ থেকে। এইজন্যে তার ভাষাকে মাতৃভাষা বলা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা আজকাল জন্মভূমিকে বলি মাতৃভূমি, সেখানকার ভাষাকে সে-কারণেও মাতৃভাষা বলা সংগত। আমার বিশ্বাস এই মাতৃভাষা শব্দটি ইংরেজি মাদার্ টঙ্‌্ শব্দের তর্জমা। সংস্কৃতভাষায় এই শব্দের চলন দেখিনি। সম্ভবত মাতৃভূমি শব্দটিও ইংরেজি মাদারল্যাণ্ড শব্দ থেকে নেওয়া। য়ুরোপীয় কোনো কোনো ভাষায় মাতৃভূমির পরিবর্তে পিতৃভূমি শব্দেরই চল বেশি।

আজকালকার গভর্নমেণ্টের শাসনে দেশ-ভাগাভাগিতে বাংলাদেশের অনেক অংশ আসাম ও বিহারের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তাহলেও সেখানকার অধিকাংশ লোকেই বাংলা বলে। সব ধ'রে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি লোক বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে।

এই বাংলাভাষাকে রীতিভেদে ভাগ করা যায়। প্রথম কথ্যভাষা, দ্বিতীয় সাধুভাষা। কথ্যভাষায় আমরা পরস্পর কথাবার্তা কয়ে থাকি। কিন্তু বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কথাবার্তার ছাঁদ এক রকম নয়। যেমন তাদের একটা মিল আছে তেমনি তাদের অমিলও নিতান্ত কম নয়। পশ্চিমে বীরভূম থেকে আরম্ভ করে পূর্বে চাটগাঁ পর্যন্ত ভাষার উচ্চারণ, ভঙ্গি এমন কি, শব্দ-ব্যবহারের তফাত যথেষ্ট। য়ুরোপীয় দেশেও প্রদেশে প্রদেশে ভাষার এরকম স্থানিক রীতিবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম প্রাদেশিক ভাষাকে অপভাষা বলা হয়। ইংরেজের দেশে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগে অপভাষার ভিন্নতা আছে; সেখানকার

চাষাভুষোরা আপনা-আপনির মধ্যে সেই ভাষায় কথাবার্তা চালায়। কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ভদ্রসাধারণে যে-ভাষা ব্যবহার করে থাকে সেটাকে বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা ব'লে স্বীকার করা হয়। এই ভাষার মূল ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশে, সেখান থেকে তার প্রভাব যে কারণেই হোক সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, এই ভাষাই তার সাহিত্যের ভাষাও বটে। ইটালি দেশেও এর দৃষ্টান্ত আছে। সেখানকার সব অপভাষাকে পিছনে রেখে টস্‌কানি দেশের বুলিই ইটালির সাধারণ ভাষা হয়ে উঠেছে, কী লেখা-পড়ায় কী কথা বলায়। এর সুবিধা যে কত, সে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অপভাষা আছে। একসময়ে রেলগাড়ির ব্যবস্থা ছিল না, চলাফেরা মেলামেশার সুযোগ ছিল সংকীর্ণ, সেই অবস্থায় অপভাষাগুলি শক্ত হয়েছিল যেন পাঁচিলে ঘেরা। এমন সময়ে ইংরেজের আমলে কলকাতা হোলো রাজধানী। পড়াশুনো, ব্যবসাবাণিজ্যে, আমোদপ্রমোদে অনেক কাল ধরে কলকাতা দেশের চারিদিক থেকেই লোক টেনে আনত। এমনি করে সকলের মিলনে রাজধানীর একটা ভাষা জেগে উঠল। সে-ভাষার ভিত হচ্ছে দক্ষিণ-দেশী বাংলা। এই বাংলাই ক্রমশ বাঙালি ভদ্রসমাজের সাধারণ ভাষা হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এই রকম একটা সাধারণ ভাষা স্বীকার করে নেওয়া সকল দিক থেকেই ভালো।

আধুনিক বাঙালির এই যে সাধারণ ভাষা অনেক দিন পর্যন্ত কথ্য-ভাষার মহলে একঘরে হয়ে আছে তাকে সাহিত্যের আসরে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান তাড়া করে এসেছে। অন্য দেশে যে-ভেদ ঘুচে গিয়ে সাহিত্যের ভাষা প্রাণবান এবং কথার ভাষা ঐশ্বর্যবান হয় আমাদের এই ভাগবিভেদের দেশে সেটা ঘটেনি। যে-কথার ভাষা যথার্থই মাতৃ-ভাষা তার 'পরে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা সাধুভাষা নামটাতেই বোঝা যায়।

অল্প কিছুদিন থেকে আমাদের কথার ভাষা সাহিত্যের দুর্গতোরণ পার হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে— তাকে ঠেকিয়ে রাখা আর চলবে না।

এ-কথা মানতে হবে যে, মৌখিক আলাপে আমরা ঢিলে ভাবে কথাবার্তা কই, সাহিত্যে কথার বাঁধুনি থাকা চাই। সাহিত্যের বিষয় অনেক সময় বাক্যালাপের বিষয়ের মতো যা-তা যেমন-তেমন নয়। তাকে ঠিকমতো বোঝাতে গেলে চলতি ভাষার শব্দ দিয়ে কাজ চলে না; কাজ চালাতে হয় সংস্কৃত-অভিধান থেকে শব্দ নিয়ে, কিংবা নতুন কথা বানাতে হয় সংস্কৃতব্যাকরণের কথা-বানানো নিয়মগুলি দিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে-জীব বা যে-বস্তুকে বের করে দেওয়া হয় তার বিশেষণ সহজ বাংলায় মেলে না। তাড়িয়ে-দেওয়া, খেদিয়ে-দেওয়া, ঝেঁটিয়ে-দেওয়া জিনিস বা জীব শব্দটা সব জায়গায় খাটবার মতো নয়। এখানে 'বহিষ্কৃত' বললে তখনি মানেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ-কথা শুনে যদি কেউ ব'লে বসেন তবেই তো মেনে নিচ্ছ সাধুভাষা নইলে সাহিত্য চলতে পারে না, কথাটা ঠিক নয়। আজকাল আমরা মুখের কথাতেই হোক সাহিত্যেই হোক, যে নানা বিষয় আলোচনা করি তার প্রয়োজনে সংস্কৃতশব্দ বা পারিভাষিক শব্দের সহায়তা না নিলে নয়। আমাদের শিক্ষার উন্নতিতে আমাদের মুখের ভাষার উন্নতি আপনিই ঘটছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা বললে লোকে পণ্ডিতিয়ানা ব'লে হেসে উঠত এখন তা আমরা অনায়াসে বলে থাকি। এমনি করেই কথার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠছে, সাহিত্যের ভাষা মিলে যাচ্ছে কথার ভাষায়।

পূর্বকালে আমরা ঘরোয়া কথা নিয়েই পরস্পর আলোচনা করে এসেছি— সেই ছিল আমাদের কথ্য ভাষা। যেই দরকার হোলো সাহিত্যের অমনি সংস্কৃতের ছাঁচে-ঢালা একটা ভাষারীতি বানানো হোলো। বানাতে অনেক চেষ্টা এবং অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

এ-বাক্যটা এখন কানে ঠেকবে না যদি কথার প্রসঙ্গে বলি, 'আজকাল সভ্যজগতে রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা যতই প্রবল হচ্ছে শান্তির সম্ভাবনা ততই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।' সভ্যজগৎ শব্দটা এর আগে কারো মুখ দিয়ে বেরত না। বাকি অংশটাও সম্পূর্ণ সাহিত্যিক জাতের। অথচ হাল রীতিতে, কথ্যে সাহিত্যে এই মিলনকে অসবর্ণ মিলন বলবে না।

একসময়ে বাংলাসাহিত্যে গুরুচণ্ডালী দোষ ব'লে একজাতীয় দোষ নিন্দনীয় ছিল। প্রাকৃত বাংলা এবং সংস্কৃত বাংলাকে একপংক্তিতে বসানোকেই বলত গুরুচণ্ডালী। মনে করো যদি লেখা যায়, 'তার মধ্যম ছেলেটি দুপুর রাত্রে সমুদ্রে লাফ দিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছে'—তবে এই বাক্যটির গুরুচণ্ডালী দোষ সংশোধন করতে হোলে লিখতে হবে, 'তাঁহার মধ্যম পুত্রটি রাত্রি দ্বিপ্রহরে সমুদ্রে লম্ফ প্রদান পূর্বক আত্মহত্যা করিয়াছে।' এখনকার দিনে এই সংশোধনের কেউ প্রয়োজন বোধ করে না, কেননা এখন কথ্যভাষা আর সাধুভাষা কাছাকাছি এসে পড়েছে, এদের ভেদ আর থাকবে না।

বাংলায় এমন একটি ভাষা বানানো হয়েছে যা বাংলার কোনো জায়গাতেই কথাবার্তায় চলে না, কেবল চলে লিখতে কিংবা বক্তৃতা করতে। লেখার ভাষায় কেউ যদি কথা কয় তাহলে শুনলে লোকে হাসবে।

সাধুভাষাকে কবে বানানো হয়েছে, কারা বানিয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত। এমন সময় ছিল যখন গদ্যভাষায় লেখা সাহিত্য ছিলই না। তখনকার কালের যে-সাহিত্য আমরা পাই তা পদ্যে। এই পদ্যভাষার এমন একটা ঐক্য বেঁধে গিয়েছিল যাকে বাংলাদেশের সকল জেলার লোকেই স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমানে যাকে সাধুভাষা বলা হয় এই সাধারণ পদ্যভাষাকে তার ভিত বলা ঠিক চলে না। তার রীতিপদ্ধতি বিশেষভাবে পদ্যেরই। প্রথমত তার বাক্য সাজানোর বাঁধা নিয়ম

নেই, ছন্দের খাতিরে তার কর্তা-কর্মের আসন সর্বদাই উলটেপালটে দেওয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই :

কার সনে নাহি জানি   করে বসি কানাকানি
সাঁজবেলা দিগ্‌বধূ মরমর স্বরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা   কী লাগি আপনহারা
বরমালা মানিকের গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে আগাগোড়া বদল করতে হবে। যথা— সন্ধ্যাবেলায় দিগ্‌বধূ কাহার সহিত বসিয়া মর্মরস্বরে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্য আত্মহারা অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্র সংগ্রহ করিয়া মাণিক্যের বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে। কর্তা-কর্মের উলটপালট তো আছেই তার উপরে সনে, তরে, লাগি প্রভৃতি অব্যয় শব্দ সাধু-অসাধু কোনো গদ্যে চলে না। তাছাড়া 'বসিয়া'র জায়গায় 'বসি', 'কুড়াইয়া'র জায়গায় 'কুড়ায়ে' গদ্যে অসহ্য। সাধুভাষায় কেউ কখনো কানাকানি করে না, করে বিশ্রম্ভালাপ। সাঁঝবেলা শব্দটা গ্রাম্য ভাষায় কোনো কোনো শ্রেণীর মুখে চলে কিন্তু সাধুভাষার চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না। এর থেকে দেখা যায় বাংলায় পদ্যের ভাষারও স্বাতন্ত্র্য আছে।

ছড়াজাতীয় কবিতা আছে, জনসাধারণের মুখে মুখে তার উৎপত্তি, তা কথ্যভাষা ঘেঁষা। যথা :

চিকন চুলের মেঘ মেলেছে পদ্মদিঘির রানী,
মুখের থেকে চুরি গেল চাঁদনি হাসিখানি।"

শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কলকাতা ও তার আশেপাশের সাহিত্যভাষাকে ভিত্তি করেই আদর্শ কথ্যভাষা গড়ে উঠেছে এবং এই আদর্শ কথ্যভাষাই আজকাল সাহিত্যের বাহন ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। মনে হোতে পারে এই কথ্যভাষায় লেখা বইগুলি বুঝি এদিককার লোকেই বোঝে,

অন্যদিকের লোকেরা বোঝে না। কিন্তু তা নয়, এই কথ্যভাষা সব জেলার অধিকাংশ লোকেই বোঝে। কারণ সব জেলা থেকেই কেউবা লেখা-পড়ার জন্যে, কেউ কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরির জন্যে কলকাতায় আসেন, বাসও করেন। তার ফলে তাঁদের দক্ষিণি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শিক্ষিত লোকেরা এদিককার কথ্যভাষা বেশ বলতেও পারেন।[১]

যাই হোক, এই বাংলাভাষার গৌরব এখন কম নয়। ভারতবর্ষের যত ভাষা আছে সে-সকলের মধ্যে ভাবসম্পদে ও সাহিত্যসম্পদে এই ভাষা সর্বপ্রধান।

দেখা যায়, আমরা যে খাদ্য খাই, তাতে আমাদের জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু সেই খাদ্য নিছক একজাতীয় নয়। ভাতের সঙ্গে নানাপ্রকার তরিতরকারি, তাছাড়া মিষ্টান্নও খেয়ে থাকি। উপকরণবৈচিত্র্যে ভোজের গৌরব বাড়ে।

ভাষাও আপনি শক্তি বাড়াবার জন্যে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে শব্দ আত্মসাৎ করে থাকে। সংস্কৃতভাষা, যাকে আমরা দেবভাষা বলি, সে-ভাষাও গ্রীক্, পারস্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনেক ভাষার কথা দখল করেছে। সেই সব কথাগুলিকে আমরা ধরতে না পেরে সংস্কৃত ব'লেই মনে করি।

ঠিক এমনি আমাদের বাংলাভাষাতেও পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, পর্টুগিজ্, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ আছে। এতে ভাষার উন্নতিই হয়েছে। আজকালও অনেক বিদেশী ভাষার কথা বাংলায় এসে

১ রাজধানী ও তার আশেপাশের জায়গার ভাষা যে সমগ্র দেশের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে পারে তার নজির রয়েছে ইংরেজিভাষায়। লণ্ডনিভাষাই সমস্ত ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসুরা এডোয়ার্ড দি ফার্স্টের সময়কার ইতিহাস দেখতে পারেন।

ঢুকছে। সেগুলিকে আমরা বাদ দিতে পারিনে। বাদ দিলে হয়তো কাজ চলে না ; দু-একটা উদাহরণ দিই :

তাঁবু, খাজনা, চশমা, খবর ;
আনারস, বোতল, চাবি, বাল্‌তি ;
হাঁসপাতাল, বেঞ্চি, ডাক্তার, গেলাস

এই বারোটা কথা সবাই জানে। সবাই এগুলির মানেও বোঝে। কিন্তু এর মধ্যে প্রথম চারটে ফারসি, মাঝের চারটে পর্টুগিজ্‌ আর শেষ চারটে ইংরেজি। এগুলি বাংলার সঙ্গে মিশে বাংলা হয়ে গিয়েছে। চাবি কথাটার বদলে অন্য কোনো কথা বলতে পারা যায় কি। এরকম বিদেশী কথা বাংলার মধ্যে অনেক আছে। নানা ভাষা থেকে কথা নিতে নিতে ভাষার শক্তি বাড়ে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এক দেশের কথা অন্য দেশের ভাষায় গেলে উচ্চারণ বদল হয়ে যায়। যেমন—ইংরেজি হস্পিটাল, বাংলায় হাঁসপাতাল হয়েছে, তেমনি গ্লাস গেলাস, জেনারেল জাঁদরেল হয়েছে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্য ভাষা থেকে যত কথাই আসুক না কেন, বাংলার বেশির ভাগ শব্দ এসেছে সংস্কৃত আর প্রাকৃতভাষা থেকে। এর মধ্যে কতগুলি শব্দ সংস্কৃতে আর বাংলায় একই বানানের। যেমন—গদ্য, পদ্য, কবিতা, পুস্তক, হস্ত, বিধি, আরম্ভ, মানসিক প্রভৃতি। কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, এ-স্থলে উচ্চারণ এক নয়। যেমন— গদ্য পদ্য শব্দের বাংলাউচ্চারণ গোদ্দো পোদ্দো। কবিতা শব্দের 'ক'-এ যে-অকারের প্রয়োগ, বাংলায় সে-অকার একেবারেই নেই, আ ছোটো করে উচ্চারণ করলে তবে সংস্কৃতভাষার অ পাওয়া যায়। তাছাড়া, কবিতা শব্দে যে 'ব' আছে সে বাংলায় মিলবে না। হাওয়া শব্দের ওয়া উচ্চারণ সংস্কৃত (অন্তস্থ) ব-য়ের সমান। আবার কবিতা শব্দে 'তা'-এ যে আ লাগাই তা সংস্কৃত উচ্চারণ হিসেবে খাটো।

"দীর্ঘস্বর বাংলাবানানে আছে, কিন্তু উচ্চারণে নেই বললেই হয়। আমরা ঈশান শব্দে লিখি দীর্ঘ ঈকার কিন্তু উচ্চারণ করি হ্রস্বই।[১] সংস্কৃতের মূর্ধন্য ণ, মূর্ধন্য ষ, দন্ত্য স বাংলায় নেই। তাছাড়া, সংস্কৃতে যেসব শব্দের শেষবর্ণ স্বরান্ত অনেকস্থলেই আমরা তাকে হসন্ত করে বলি। যেমন— জল্, রমেশ্। রামচন্দ্র শব্দের শেষবর্ণ যেমন স্বরান্ত, রাম শব্দেরও তেমনি হওয়া উচিত ; কিন্তু আমরা বলি রাম্ চন্দ্রো।

প্রচলিত বানানের ওপরে চোখ রেখে আমাদের ভ্রম হয় যে, বাংলা-ভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দ বিস্তর আছে। কিন্তু উচ্চারণ অনুসারে বানান করলেই দেখা যায় প্রায় তার সমস্তগুলিই বিকৃত। এই রকম বানানে একটি বাংলাবাক্য লিখে দেখা যাক :

—ওদ্দো স্পেন রাজ্জে জে ভীশোন জুদ্ধো শংখোভিতো, তার ফুক্খো ওতি অশোজ্ঝো, শোব্ভো দেশের জোগ্গো নয়"—[২]

অনেক বাংলাশব্দ সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে না এসে প্রাকৃতের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। যেমন— সংস্কৃত হস্ত শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে হত্থ। হত্থ থেকে বাংলায় হয়েছে হাত। সর্প থেকে সপ্প, সপ্প থেকে সাপ। মস্তক থেকে মত্থঅ, মত্থঅ থেকে মাথা। আরো একরকম শব্দ আছে যেগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে আসেনি সেগুলি দেশী। যেমন— ধামা, ঝুড়ি, ঝাঁটা, ঠ্যাং, গোড়া, গোঁজ, কাতুকুতু, হাঁচি প্রভৃতি।

আইন আদালত সংক্রান্ত অধিকাংশ কথাই ফারসি বা আরবি। তার কারণ মধ্যযুগে সুলতান ও বাদশাদের আমলে ফারসিই রাজভাষারূপে

১ তেমনি উরু, উষর শব্দে দীর্ঘ উকে হ্রস্ব উ উচ্চারণ করি। সংস্কৃতে এ ঐ ও ঔ এই চারটি দীর্ঘ স্বর। বাংলাতে (প্রাকৃতেও) এগুলির হ্রস্ব উচ্চারণও আছে।

২ কাজেই বাংলায় উচ্চারণের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় 'সংস্কৃত সম' (তৎসম) নামক শব্দ বাংলায় প্রায় নেই-ই, 'তদ্ভব' শব্দই প্রায় সব।

স্বীকৃত হয়েছিল। ওই সুলতান ও বাদশারা জাতিতে ছিলেন তুর্কি। কিন্তু তুর্কি ভাষার পরিবর্তে তাঁরা ফারসি ভাষাকেই রাজকীয় ভাষা ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার ফারসি ভাষাতে অনেক আরবি কথাও ঢুকে গিয়েছিল। তাই ফারসি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আরবি শব্দও বাংলাভাষায় এসে গেছে। শুধু রাজকার্য নয়, তৎকালীন ফারসি সাহিত্যের প্রভাবেও ফারসি শব্দের আমদানি হয়েছে। মোট কথা, যে-সব কারণে আজকাল ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হচ্ছে, ঠিক সে-সব কারণেই তৎকালে ফারসি ও আরবি কথার আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন— খাজনা, পেয়াদা, বন্দোবস্ত, জরিপ, জমিদার, রায়ত ইত্যাদি। এছাড়া নিত্যপ্রচলিত বিস্তর শব্দ বাংলায় আছে যা ফারসি বা আরবি। যেমন— নেহাত, বিলাত, তারিখ, হপ্তা, ফরমাশ, কবুল, বেহায়া, মেজাজ, বদমায়েশ ইত্যাদি। ফারসি ও আরবি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু তুর্কি কথাও বাংলায় এসেছে। যথা— বাবুর্চি, দারোগা, কাঁচি, কাবু, বোঁচকা, আলখাল্লা, কুলি, বাহাদুর, বিবি, বেগম ইত্যাদি। এ-সব শব্দেরও মূল উচ্চারণের অনেকস্থলে হয়েছে বদল। বাংলায় অনেক য়ুরোপীয় শব্দও বেমালুম ঢুকে পড়েছে। যেমন— আলমারি, দেরাজ, টেবিল, কামিজ, পুলিস, জেল, ইস্টেশন ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিকাল থেকেই সংস্কৃতভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটেছে। এই কারণে সংস্কৃতের রচনারীতি বাংলাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তথাপি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার অমিলই বেশি।

এখানে বাংলাভাষার এই রকম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সংস্কৃতে বিশেষ কয়টি জায়গা ছাড়া অন্যত্র দুটো স্বরবর্ণ পাশাপাশি থাকলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। যেমন— শশাঙ্ক, প্রত্যেক প্রভৃতি। বাংলায় এ-নিয়ম খাটে না। খাঁটি বাংলায় সন্ধি

নেই বললেই চলে। কেবল বারেক, তিলেক, অর্ধেক, হরেক, আরেক, একেক, দশেক প্রভৃতি কয়েকটি কথায় সন্ধি আছে। তাও আবার সংস্কৃত নিয়মে নয়। এসব স্থলে সংস্কৃতে বারৈক, তিলৈক, অর্ধৈক হওয়া উচিত।

এ, তে, য়, কে, রে, র, এর এই কয়টি বাংলাবিভক্তি ; এগুলি দিয়ে কারক প্রকাশ করা হয়। যেমন— বাঘে (বা বাঘেতে) মানুষ খায়। এখানে এ অথবা এতে যোগ করে কর্তাকে বুঝাল। তেমনি আগুনে (আগুনেতে) হাত পুড়ে গেছে, এখানে করণকারক, আর ঘরে (ঘরেতে) টেবিল আছে, এখানে অধিকরণকারক বুঝাল। তিন জায়গাতে এ বা এতে যোগ করা হয়েছে।

কর্মপদে কোথাও বা কে অথবা রে যোগ করা হয়। বেশির ভাগ শব্দেই 'কে' থাকে না। যেমন— সে রামকে দেখছে। কিন্তু সে ভাত খাচ্ছে, চিঠি লিখছে ইত্যাদি। সম্প্রদান বুঝাতে 'কে' বিভক্তি সব সময় যোগ করা হয়। যেমন— এটা রামকে দাও। জন্য, থেকে, চেয়ে, হতে প্রভৃতি শব্দগুলি বিভক্তি নয়, কিন্তু কারক-প্রকাশক। এরকম কারক-প্রকাশক আলাদা শব্দ সংস্কৃতে নেই।

বাংলায় দ্বিবচন নেই, সংস্কৃতে আছে। টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, একবচনে প্রযুক্ত হয়। এগুলি বাংলার নিজস্ব। ছেলেটা ছেলেটি, কাপড়খানা কাপড়খানি, ছড়িগাছা ছড়িগাছি প্রভৃতি আমরা অনবরতই বলে থাকি।

আবার বহুবচনে রা, এরা, গুলি, দিগ, দের যুক্ত হয়। রা, মানুষ প্রভৃতি উচ্চ জীববাচক শব্দের বহুবচনে প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। যেমন— ছেলেরা, মুনিরা, দেবতারা ইত্যাদি। কিন্তু ঘাসেরা বা ঝুড়িরা বলা হয় না ; এসব স্থলে 'গুলি' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। একটু অবজ্ঞা বোঝাতে 'গুলির' স্থলে 'গুলো' বলা হয়। ছেলেগুলো, গোরুগুলো ইত্যাদি।

কর্মে, সম্বন্ধে— দিগকে, দিগের, দের যোগে বহুবচন সূচিত করে। যেমন— বালকদিগকে, বালকদিগের, বালকদের। কথ্যভাষায় একমাত্র 'দের' শব্দই প্রযোক্তব্য। যেমন— ছেলেদের দেখো, ছেলেদের দাও, ছেলেদের বইপত্র। রবীন্দ্রনাথ স্থলবিশেষে 'দেরকে' বিভক্তি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যথা— আমাদেরকে তোমাদের খাওয়াতে হবে।

সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গশব্দের বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গবোধক প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন— আনন্দিত বালক, আনন্দিতা বালিকা। বাংলায় 'বতী' 'মতী' (কখনো কখনো ঈ) ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ-বোধক প্রত্যয় প্রায়ই যোগ করা হয় না। সেজন্য— 'আনন্দিত বালিকা,' বা 'মা দুঃখিত হলেন' বলা চলে। বোকা ছেলে, বোকা মেয়ে, চালাক ছেলে, চালাক মেয়ে প্রভৃতি খাঁটি বাংলাবিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গবোধক কোনো প্রত্যয় বসে না।

বিশেষ্যের বেলাতেও অনেকস্থলে কোনোরকম প্রত্যয় ব্যবহার না করে স্ত্রীজাতি বোঝানো হয়। যেমন— বেড়াল, মাদি বেড়াল; ছাগল, মাদি ছাগল প্রভৃতি। তবে সংস্কৃতের মতো ঈ, ইনী বা নী প্রত্যয় যোগ ক'রেও স্ত্রীত্ববোধক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন— মামী, পিসী, সিংহিনী, কলুনী, জেলেনী ইত্যাদি। ক্রিয়াপদে বাংলায় অন্য ক্রিয়া যোগ ক'রে ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন— বসে পড়ল, ব'লে উঠল, করে বসল, করে ফেলল, খেয়ে নিল। এসব স্থলে পড়ল, উঠল, বসল, ফেলল, নিল ক্রিয়াপদ নিজ অর্থ হারিয়ে পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলির অর্থকেই বিশেষিত করছে।

তারপর সংস্কৃতে একই ধাতুর পর নানা রকম প্রত্যয় যোগ করে অনেক রকম শব্দ করা যায়। যেমন— গম্ ধাতু থেকে গন্তব্য, গম্য, গমন, দুর্গম, গত, গতি প্রভৃতি কত রকম শব্দ হয়। তেমনি কৃ ধাতু

থেকে কর্তব্য, করণীয়, কার্য, কৃত, কৃতি, করণ, কর্ম, কর্তা, কৃত্রিম, কার, কর প্রভৃতি শব্দ গঠিত হয়। এগুলির মধ্যে অর্থেরও পার্থক্য আছে।

আবার— উপসর্গ যোগ করে, একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে বদলানো যায়। যেমন— কৃ ধাতু থেকে 'কার' শব্দ হোলো। তাতে উপসর্গ যোগ করে প্রকার, আকার, বিকার, সংস্কার, অধিকার, অপকার, উপকার প্রভৃতি কত অর্থের শব্দ তৈরি করা গেল। সংস্কৃতে এই রকম অনেক শব্দ একই ধাতু থেকে তৈরি করা যায়। এই কারণেই সংস্কৃতের ওপর বাংলার নির্ভর অপরিহার্য। খাঁটি বাংলায় তা হয় না। যেমন— ঠ্যাল্ ধাতু, তার থেকে ঠ্যালন, ঠেলিতব্য প্রভৃতি কিছুই হবে না। তেমনি চাহ, কহ, বল, থাম প্রভৃতি বাংলাধাতু থেকে কোনো প্রত্যয় যোগ করে শব্দ তৈরি করা মুশকিল। এগুলি কেবল ক্রিয়াপদেই চলে। যেমন— চাকরে গাড়ি ঠেলছে, টাকা চাচ্ছেন, কথা কইছেন ইত্যাদি। তবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বাংলাধাতু থেকে বিশেষ প্রত্যয় যোগে শব্দ তৈরি হয় বটে। তার গোটাকয়েক নমুনা দেওয়া যাক :

আ— পড়া, চলা, বলা, ধরা
অন— বাঁধন, নাচন, কাঁদন
আনো— চালানো, কাঁদানো, বাড়ানো
নি— চালনি, খাটনি, চাটনি
তি— কম্‌তি, বাড়তি, ফিরতি

এই রকম কতগুলি শব্দ বাংলাতে আছে।

একই ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ বাংলার একটি বিশেষত্ব। সংস্কৃতে উপসর্গ যোগে ধাতুর অর্থ বদলায়, বিনা উপসর্গে দু-তিনটের বেশি অর্থ হয় না। কিন্তু বাংলায় নিচের উদাহরণগুলি দ্রষ্টব্য :

ধরা— মাথা ধরা, চোর ধরা, কলম ধরা, মুখ ধরা, বৃষ্টি ধরা, মনে ধরা, হাত ধরা, উনান ধরা ইত্যাদি।

লাগা— কাজে লাগা, ভালো লাগা, নৌকা লাগা, চোখ লাগা ইত্যাদি।

উঠা— চুল উঠা, গোঁফ উঠা, কথা উঠা, চোখ উঠা ইত্যাদি।

এইসব স্থলে লক্ষ্য করলেই অর্থের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়।

এই রকম নানা দিক দিয়েই দেখলে দেখা যায় বাংলাভাষার যে নিজস্ব চাল আছে তা সংস্কৃতের সঙ্গে মেলে না। সেজন্য বাংলাকে সংস্কৃতব্যাকরণ অনুযায়ী গড়ে তুলতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা-মাত্র। সংস্কৃতে ঋ, র্ ও ষ্ এই তিন বর্ণের পরে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়; তাই কর্ণে স্বর্ণে মূর্ধন্য ণ কিন্তু বাংলা কান সোনা প্রভৃতি শব্দে ঋ, র্, ষ্ নেই তাই ও-সব শব্দে মূর্ধন্য ণ হবারও হেতু নেই।

তেমনি, গভর্নমেন্ট, বোর্নিও, আর্নল্ড্ প্রভৃতি বাংলাঅক্ষরে লিখলে মূর্ধন্য-ণ-য়ে রেফ লেখা অনুচিত।

অনুরূপ কারণেই অসংস্কৃত শব্দে ষত্ব-বিধানও স্বীকার্য নয়। তাই 'জিনিষ' না লিখে 'জিনিস' লেখাই সমীচীন, বিশেষত আমাদের স-য়ের উচ্চারণই 'শ'-য়ের মতো।

এতক্ষণ ব্যাকরণের কথা বলা হোলো। এখন আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাক। বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে শব্দ নিয়েছে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে তার অর্থ নেয়নি। ভাষা নিজেই তাকে বিশেষ অর্থ দিয়েছে। প্রথমে ধরা যাক— 'এবং' শব্দ, এটা খাঁটি সংস্কৃতশব্দ। কিন্তু সংস্কৃতে মানে— 'এইরূপ', বাংলায় মানে 'আর'। এই রকম আরো কতকগুলি শব্দ দেওয়া গেল :

শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	বাংলা অর্থ
ভাসমান	দীপ্তিমান	জলের উপরে অবস্থিত
অথর্ব	বেদ ও ঋষির নাম	শক্তিহীন
সন্দেশ	খবর	মিষ্টান্ন

শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	বাংলা অর্থ
বেদনা	অনুভূতি	ব্যথা
ইতর	অন্য	হীন বা নীচ
উপন্যাস	নিকটে স্থাপন	গল্প
প্রজাপতি	ব্রহ্মা ও কশ্যপ প্রভৃতি	পতঙ্গ বিশেষ
প্রশস্ত	প্রশংসিত	চওড়া
ভাস্কর	সূর্য	পাথরের মিস্ত্রি
রাষ্ট্র	রাজ্য	রটনা করা
বিলক্ষণ	বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত অথবা লক্ষণহীন	বেশি
বিজ্ঞান	জ্ঞান বা বুদ্ধি	সায়ান্স্
সচরাচর	স্থাবর জঙ্গমের সহিত	প্রায়
ব্যস্তসমস্ত	আলাদা ও একসঙ্গে	দেহে ও মনে ত্বরান্বিত

এরকম শব্দ আরো অনেক রয়েছে। "এছাড়া আমরা সংস্কৃতমূলক শব্দ নতুন অর্থে বাংলায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। যেমন—সমালোচনা, সম্পাদক, সহানুভূতি, জাতীয়তা ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের রচনার বিষয় বেড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমাদের ভাষাও এগিয়ে চলেছে।"

সাহিত্যের লক্ষণ

"এইবার সময় হয়েছে বিচার করবার, আধুনিক ভাষায় সাহিত্য বলতে আমরা সচরাচর কী বুঝি।

মানুষ যা জানে, তা মনে রাখবার বা অন্যকে জানাবার জন্য স্মরণযোগ্য সুসংলগ্ন ভাষায় গেঁথে রেখেছে। পূর্বাপর চলে আসছে যেসব

ঘটনা, তার সম্বন্ধে মানুষ যা-কিছু খবর পেয়েছে, তা সে সঞ্চয় করেছে ইতিহাসে, দেশবিদেশের বিবরণ সম্বন্ধে তার জানা বিষয় টুকে রেখেছে ভূগোলে। মানুষ চিন্তা করে যা জেনেছে, বা দেখেশুনে যেসব খবর পেয়েছে, তা সে ধরে রেখেছে— দর্শনে, বিজ্ঞানে, নানাবিধ বর্ণনায়।

কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা কেবল তো জানার বিষয় নিয়ে নয়, সে সুখদুঃখ ভোগ করে, ভক্তি বা ঘৃণা অনুভব করে। এই সব বোধ নিয়ে তার হৃদয়ের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকেও সে স্মরণীয় রূপ দিয়ে নিজের স্বভাবের পরিচয় দিতে চায়। যে-স্বভাব নিয়ে কোনো বিষয়কে তার ভালো লাগে, কোনোটিকে লাগে মন্দ, পূজনীয়কে করে পূজা, নিন্দনীয়কে করে নিন্দা, সুন্দরকে দেখে আনন্দ পায়, অসুন্দরকে দেখে তার বিতৃষ্ণা লাগে। ভাষার ভেতর দিয়ে সেই স্বভাবকে প্রকাশ করার উপায় সাহিত্য। রামায়ণকে আমরা সাহিত্য বলি। রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনা যদি নিতান্ত শুকনো রকম করে টুকে রাখা হোত, তাহলে তা সাহিত্য ব'লে জগতে প্রসিদ্ধ হোত না। রামের জীবনবৃত্তান্তকে অবলম্বন করে, কবি ভক্তি, প্রীতি, আশা, নৈরাশ্য, করুণা, জয়োৎসাহ প্রভৃতি নানা ভাবের সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানের বিষয় নিয়ে যেসব লেখা, তার ভাষা হওয়া চাই স্পষ্ট, অর্থসংগত, যথাতথ, অত্যুক্তি ও অলংকার বর্জিত। কিন্তু হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে গেলে তাকে ছন্দ দিয়ে ভাষার ভঙ্গিমা দিয়ে অলংকার দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হয়। এমন কি, ভাষা কিছু অস্পষ্ট করারও দরকার হোতে পারে; ভাব-প্রকাশে যথোচিত অত্যুক্তি থাকলেও দোষের হয় না, না থাকলেই বরং ভাবটা মনের মধ্যে প্রবেশের দরজা যথেষ্ট খোলা পায় না।

কবি লিখছেন— লাখো লাখো যুগ তোমাকে হিয়ায় হিয়ায় রাখলুম তবু হৃদয় তৃপ্ত হোলো না। জ্ঞানের দিক থেকে কথাটা অত্যন্ত অসংগত, পাগলামি বললেই হয়। লক্ষ-লক্ষ যুগ কেউ বাঁচতে পারে এ নিয়ে

তর্কই চলে না। কিন্তু এখানে ভালোবাসার প্রবলতা জানাবার চেষ্টায় মন যখন আঁকুবাঁকু করে তখন প্রকৃতপক্ষে যে-কথাটা অসত্য, ভাবের পক্ষে সেটাই সত্য হয়ে ওঠে। তখন বলবার কথাকে বাঁকিয়ে বাড়িয়ে, সাজিয়ে তার সহজ মানেকে অস্পষ্ট করে দিয়ে সাহিত্য আপন কাজ চালায়। ঠিকমতো এ-কাজটি করতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার দরকার করে। যাঁরা পারেন সমাজে তাঁরা সম্মান পেয়ে থাকেন। মুখ্যত ভাব-প্রকাশের এই ভাষাবাহন হচ্ছে সাহিত্য।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যেসব ব্যাপার স্বভাবতই অপ্রিয়, দুঃখ-জনক, সাহিত্যে মানুষ তাকেও এত মূল্য দেয় কেন, সীতার বনবাস পড়ে চোখের জল ফেলার দরকার কী। এর সহজ উত্তর হচ্ছে, মনের ধর্ম হচ্ছে জানা, এইজন্যে মন সব-কিছু জানতে ভালোবাসে। হৃদয়ের ধম হচ্ছে অনুভব করা, এইজন্য অনুভব করায় তার আনন্দ আছে, নইলে ধৃতরাষ্ট্রের সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমান সে শুনতেই চাইত না। কারো নিজের ছেলে যদি অভিমন্যুর মতো সাত-রথীর মার খেয়ে মরত, তাহলে সে হয়তো পাগল হয়ে যেত। কিন্তু অভিমন্যুর পালা শোনবার জন্যে সে সাত ক্রোশ তফাত থেকে চলে আসে। দুঃখের কারণটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের পীড়াজনক। কিন্তু ব্যবহার থেকে ছিনিয়ে নিলে তার বোধটা আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে। ভূত যদি সত্যি সামনে আসে কোনো ছেলে নেই যে তাতে রস পায়। কিন্তু ভূতের গল্প বলবার জন্যে দাদামশায়কে সে অস্থির করে তোলে। অর্থাৎ যে-ভূত প্রত্যক্ষ মারাত্মক তাকে ব্যবহার থেকে বাদ দিয়ে, কেবল তার থেকে ভয়ের বোধটা ছেঁকে নিলে সেটাতে পুলক সঞ্চার করে। অথচ সংসারে ভয় জিনিসটা স্পৃহণীয় নয়, যেহেতু তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সে আশঙ্কা না থাকলে ভয় জিনিসটি থেকে রস পাই। যারা স্বভাবত সাহসী তারা আশঙ্কার কারণ থেকেও আনন্দ পায়, তারা যায় দুর্গম পর্বত লঙ্ঘন করতে, সম্ভবপর

বিপদের বোধে তাদের আনন্দ। আমার সাহস নেই, তাই প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে পর্বত লঙ্ঘনের বিবরণ যখন পড়ি, তখন মহা উৎসাহ বোধ হয়। বীর মরছে যুদ্ধে, নিজের পক্ষে সেটা আমি একটুও ইচ্ছে করিনে, কিন্তু সাহিত্যে সেই বীরের মরণবৃত্তান্ত কেবল যে পড়ে খুশি হই তা নয়, বুক ফুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে তার পালা অভিনয় করেও থাকি। এর থেকে বোঝা যায় মানুষের হৃদয় সকল রকম প্রবল বোধেই আনন্দ পায়। দুঃখবোধের তীব্রতা বেশি ব'লেই সাহিত্যে শোকাবহ ব্যাপারের 'পরেই তার টান বেশি হয়ে থাকে। তাই বলছি সাহিত্য মুখ্যত মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, বোধের ভাণ্ডার।"

সাহিত্যের উৎপত্তি

মানুষের রচনার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে বেদ। এই বেদ সেকালে মুখে মুখে শুনে মুখস্থ করে রাখা হয়েছিল। এইজন্য বেদের আর-এক নাম শ্রুতি। বেদ-রচনার যুগে লেখার চলন হয়নি। শুনে শুনে মনে রাখতে হোত ব'লে বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সব দেশেরই প্রাচীনতম সাহিত্যের ঘটেছে ওই দশা। কতশত সাহিত্যকথা কালগর্ভে চিরদিনের জন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

মানুষের অতি প্রাচীন সাহিত্যচেষ্টার উদ্ভব কিসের থেকে, তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত।

"মানুষের জীবন যখন সুরক্ষিত ছিল না, তখন বিপদআপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ নানাপ্রকার জাদুমন্ত্রের শক্তি কল্পনা করেছে, তাছাড়া দেবদেবীকে প্রসন্ন করার 'পরেও তাদের ভরসা ছিল। বিপদ থেকে রক্ষা ও প্রার্থনীয় জিনিস পাওয়ার ইচ্ছা, এবং পেলে তাই নিয়ে

আনন্দ করাতেই মানুষের প্রথম অপরিণত ভাষার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধে জয় প্রভৃতি স্মরণযোগ্য ঘটনা ও যুদ্ধজয়ী বীরদের প্রশংসাবাদ ক্রমশ সাহিত্যকে অধিকার করতে লাগল। এমনি করে ক্রমে ক্রমে মানুষের ভাষা জমে উঠেছে ও তার মুখ খুলে গেছে। আজ পর্যন্ত সে-মুখ আর বন্ধ হোলো না। সাহিত্যের ধারা দেশে দেশান্তরে বয়ে চলেছে, তার ভেতর দিয়ে মানুষের অভিরুচি, মানুষের অভিলাষ, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বিচিত্র ছবি বাইরে প্রকাশ করে দিচ্ছে, এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বেড়ে উঠেছে। মানুষের হৃদয়ের মহত্ত্ব তার প্রসার কোন্ জাতের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে, তার আনন্দসম্পদের কত বৈচিত্র্য ও মহামূল্যতা তা তার সাহিত্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।"

প্রাচীন যুগ

মনসামঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

সেকালে পশুর হাতে, মানুষের হাতে আর দৈব দুর্গতিতে বাংলা-দেশের মানুষ যখন নানাপ্রকারে ছিল আতঙ্কিত, তখন তার সে-আতঙ্ক সাহিত্যকেও অধিকার করেছিল, তা স্পষ্টই দেখা যায়। বর্তমান যুগেও ভারতবর্ষেই প্রতি বছরে বারো হাজার থেকে সতেরো হাজার পর্যন্ত লোক মারা যায় সাপের কামড়ে। সেকালে কত যে মরত তার তো কোনো সংখ্যাই পাওয়া যায় না।

ছেলে গিয়েছে মাঠে চাষ করতে সে-ছেলে আর ঘরে ফিরে এল না। সাপের কামড়ে মারা গেল। খেয়ে-দেয়ে গেল শুতে, সে আর জেগে উঠে সকালের সূর্য দেখতে পেল না। রাতে বিছানাতেই সর্পাঘাতে মারা গেল। সাপ আবার এমনি প্রাণী যে, অপ্রত্যাশিতভাবে কোথা থেকে যে এসে পড়ে তার নেই ঠিক। এই সব নানা কারণে সাপের সঙ্গে একটা অলৌকিক শক্তির যোগ অনেকেই কল্পনা করে থাকে। অন্য প্রাচীন দেশেও তার প্রমাণ আছে।

বর্ষার সময়টাই সাপের উপদ্রব বেশি। কাজেই সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাপের দেবতার কৃপালাভ করা নিতান্ত দরকার। এই মনে করে গ্রামে গ্রামে সাপের দেবতার পূজার অনুষ্ঠান হয়।

এই দেবতার নাম মনসা দেবী। ইনি শিবের মেয়ে। এঁর পূজা উপলক্ষ্য করে নানা কবিতে নানারকম গান বেঁধেছেন। এই গানগুলিকে 'ভাসান' গান বলে। এখানে এই ভাসান গানের কাহিনীটা দেওয়া গেল।

মনসামঙ্গল কাহিনী

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর ॥

দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে
তথাপি দেবতা বলি না মানে তাহারে ॥

মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা
বলে চ্যাংমুড়ি বেটী কিসের দেবতা।
হেঁদাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে ॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর ॥

শিব মনসাকে বলেছিলেন, চাঁদসদাগর পূজা না করলে তোমার পূজা জগতে প্রচারিত হবে না। অথচ চাঁদসদাগর শিবের পরমভক্ত, শিব ছাড়া আর কাকেও পূজা করবেন না। মনসা প্রথমে লোভ তার পর ভয় দেখালেন সাপের কামড়ে ছয় ছেলে মারা গেল কিন্তু সদাগর নিজের জেদ থেকে টললেন না।

(চাঁদ) এইরূপে কিছুদিন করিয়া যাপন
বাণিজ্যে চলিল শেষে দখিন পাটন ॥
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙার ভিতর ॥
চাঁদবেনের বিসম্বাদ মনসার সনে।
সাধু কালীদহে দেবী জানিলেন ধ্যানে ॥

চাঁদকে জব্দ করবার জন্যে দেবী ঝড়বৃষ্টি তুললেন।

অবনী আকাশে প্রখর বাতাসে
হৈল মহা অন্ধকার।
গটীয়া গাবর নায়ক নফর
নাহিকো দেখে নিস্তার ॥

চাঁদের ডিঙা ডুবল। মাঝিমাল্লা জিনিসপত্র সবই ডুবল।

চক্ষু রাঙা পেট ভরে খাইয়া চুবনি
তবু বলে দুঃখ দিল চ্যাংমুড়ি কানী ॥

চাঁদ মরলে দেবীর পূজার প্রচার হয় না, তাই দেবী তাকে রক্ষা করলেন। চাঁদ এক-কাপড়ে ভিক্ষা করতে করতে বহু কষ্টে বহু দুঃখে দেশের পানে চললেন।

দেশ দেশান্তরে চাঁদ সদাগরে
অশেষ যন্ত্রণা পায়
পুনর্বার ঘরে সনকা উদরে
লখাই জন্মিল তায়।

চাঁদের স্ত্রীর নাম সনকা। তাঁর অমন ছেলেটি হোলো। কিন্তু

ললাট কপালে তার বিধি লেখে দুরাচার
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে।

বিয়ের রাতে বাসরে সাপের কামড়ে মারা যাবে এই হোলো ছেলেটির কপালের লেখন।

চাঁদসদাগর আইলা নিজ ঘর
ডুবাইয়া তরী জলে।
কাতর বেনেনী চক্ষে পড়ে পানি
আপন প্রভুরে বলে ॥
শুন সদাগর কোথা মধুকর
কহ তব পায় পড়ি
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
কালীদহে হৈল বুড়ি।

আমি নাহি জানি চ্যাংমুড়ি কানী
দুখ দিল নানাপাকে
হৈল ভরা ডুবি ঝাঁপ দিয়া পড়ি
জল খাই নাকে মুখে ॥

তার পর : দেখি পুত্রমুখ সাধুর কৌতুক
সর্ব শোক পাশরিল।
পুত্র কোলে করি চাঁদঅধিকারী
তার মুখে চুম্ব দিল ॥

ছেলেটির নাম লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র)। সে পড়াশোনাতে ভালো, দেখতেও খুব ভালো। ক্রমে ক্রমে সে বড়ো হয়ে উঠল।

নিছনি নগরে বেনে সায় অধিকারী
তাহার বনিতা, নাম অমলাসুন্দরী ॥

এদের মেয়েটি ভারি সুশ্রী। ছেলেবেলা থেকে মেয়েটি নাচতে পারত। তার নাম বেহুলা।

মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ পায় ॥

এই নাচতে পারার জন্যে সকলে তাকে বেহুলা নাচনী বলত। এরই সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ের সম্বন্ধ হোলো। এ-বিয়ের পরিণাম কী চাঁদসদাগর জানেন জেনেও যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করছেন। কথা হোলো বিয়ের রাতে বর কনের বাড়িতে থাকবে না। সাঁতালি পর্বতে বরের জন্য যে লোহার বাসরঘর তৈরি হচ্ছে তাতে এসে থাকতে হবে। চাঁদসদাগর এমনভাবে লোহার বাসর তৈরি করলেন যাতে কোনো কিছু তার ভেতর না যেতে পারে। বাসরের চারিদিকে নানারকম সর্পনিবারক ওষুধপত্র রেখে সাপখেগো পশুপাখি ছেড়ে দিলেন।

যথাসময় লখিন্দর আর বেহুলার বিয়ে হয়ে গেল। বর-কনে সাঁতালি পর্বতে চলে এল। এদিকে মনসাদেবী বারে বারে সাপ পাঠাতে লাগলেন, যাতে তারা লখিন্দরকে কামড়ায়। বেহুলা জেগে আছেন দেখে তারা ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

লখিন্দর বলে শুন বেহুলা নাচনী
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ভোখ লাগে ছানি
রাত্রির ভিতর যদি করাও ভোজন।
তবে জানি প্রিয়া মোর রাখিল জীবন।
বেহুলা বলেন ওহে মম প্রাণনাথ
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত।

যাই হোক একটা উপায় তো করতে হবে। তাই বেহুলা :

মঙ্গল মাঙ্গল্য ছিল মঙ্গলিয়া হাঁড়ি
তিন নারিকেল দিয়া সাজায় তেগুঁড়ি

নারকোলের জল দিয়ে বরণডালার চালে, নিজের চাদর ছিঁড়ে জ্বাল দিয়ে তিনি রান্না করতে আরম্ভ করলেন।

নেতের অঞ্চল ছিঁড়ি জালিল আগুন
হেথায় দেবীর ক্রোধ বাড়িল দ্বিগুণ।

দেবীর মায়ায় বেহুলার চোখে ঘুম এল।

কালনিদ্রা হৈল তার দেবীর মায়ায়
ঢলিতে ঢলিতে বামা প্রভুরে জাগায়।

তখন : বাসরে প্রবেশ কৈল সে কালনাগিনী
বেহুলা লখার রূপ দেখিল আপনি।
বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥

জাগহ ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি।

ভোর হোতে না হোতেই লখিন্দর মারা গেলেন। সমস্ত নগর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কপালের লেখা কে খণ্ডায়। বেহুলা তার সদ্যোমৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলাতে চড়ে, তাঁকে বাঁচিয়ে আনবেন প্রতিজ্ঞা করে, গাঙুড় নদী দিয়ে ভেসে চললেন। নদীর দু-ধারের লোক অশ্রুপূর্ণ চোখে এই করুণ দৃশ্য দেখতে লাগল।

পথে কত বিপদ কত আপদ, কত বিভীষিকা। বেহুলা কিছুতেই বিচলিত হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ধর্মবলে তিনি স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবেন। ভেসে যেতে যেতে স্বর্গের ধোপানী নেতার সঙ্গে বেহুলার সাক্ষাৎকার ঘটল। এই নেতা আবার মনসারও প্রিয়সখী। বেহুলা নেতার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

নেতা বলে শুন রামা পদ ছাড় মোর।
কহ দেখি মোরে যত পরিচয় তোর।
সবিনয়ে বলে সব বেহুলা নাচনী
অশেষ পাপের ভাগী আমি অভাগিনী।
বেহুলার লোচনে দেখিয়া শোকজল
নেতাই ধোপানী বলে হইয়া বিকল।
পদ ছাড় শুন রামা বিলম্ব না সয়
ত্বরায় যাইতে চাই দেবতা আলয়।

বেহুলাকে নিয়ে নেতা স্বর্গে গেলেন। সেখানে বেহুলা নাচলেন। তাতে সমস্ত দেবতা খুব খুশি হলেন। শিব সেই সভাতে ছিলেন। তিনি বেহুলার সমস্ত কথা শুনে মনসাকে ডাকিয়ে এনে বেহুলার স্বামীকে বাঁচাতে বললেন।

মনসা লখিন্দরকে বাঁচিয়ে বেহুলাকে বর দিতে চাইলেন। বেহুলা বর চাইলেন তার ছয় ভাশুর যমালয় থেকে ফিরে আসুক আর চাঁদসদাগরের সেই যেসব ডিঙা ডুবে গেছে সেগুলি ভেসে উঠুক। মনসার বরে তাই হোলো। কিন্তু কথা রইল বেহুলা ফিরে গিয়ে চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন। সকলকে নিয়ে বেহুলা ফিরলেন।

নগর নিকটে আইল আপনার দেশ
স্বর্গের কিন্নরী হেন বেহুলার বেশ।
লখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায়
বেহুলা সাবিত্রী যারে মনসা সহায়।

চাঁদবেনে সব ঘটনা শুনে বললেন :

কোথা সে বেহুলা মোর কোথা সে লখাই
মরা পুত্র জীয়ন্ত পুরীতে যদি পাই,
তবে সে পূজিব আমি মনসার বার,
শুনিঞা হরষ হৈল পুরে যত তার।
দেখিয়া শুনিয়া সভার বাড়িল উল্লাস,
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ।

এর পর চাঁদসদাগর ধুমধাম করে মনসার পূজা করলেন। কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে মনসাকে পূজা করলেন। কেননা, চাঁদ বললেন, যে-হাত দিয়ে শিবের পূজা করি সে-হাত দিয়ে আর-কারো পূজা করব না। মনসা চাঁদের হাতে পূজা পেলেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হোলো আর তখন থেকে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হোলো।

এই হোলো মনসামঙ্গলের মোটামুটি গল্পটা। মনসার এক নাম পদ্মা, সেজন্য পদ্মাপুরাণ, মনসামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতি নানা নামে এই একই গল্প প্রচলিত।

এই কাহিনী অবলম্বন ক'রে হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, বংশীদাস প্রভৃতি অনেক কবিই মনসামঙ্গল অর্থাৎ মনসাগানের পালা রচনা করেছেন। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের, আর দক্ষিণবঙ্গে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দের রচিত পালাই চলে, লোকেও শুনতে ভালোবাসে। আজকাল এই বই দুখানি ছাপানোও হয়েছে।

শোনা যায় একবার বংশীদাস গান গেয়ে ফিরছিলেন। পথে ডাকাতের দল তাঁকে ধরল। তিনি বললেন, আমাদের যা আছে সব নিয়ে ছেড়ে দাও। ডাকাতের সর্দার কেনারাম বলল, তোমরা আমাদের চিনে নিলে, অনেক জায়গায় তোমরা ঘোরো, ছেড়ে দিলে আমাদের ধরিয়ে দিতে পারো, কাজেই তোমাদের মেরে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। বংশীদাস বললেন, তাই যদি হয় তবে জীবনে শেষবার গান গাইতে দাও। ডাকাতরা স্বীকার করল। নির্জন বিলের ধারে বংশীদাস মনসার পালা গাইতে লাগলেন, ডাকাতরা শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে তাদের মন গলে গেল, মতি গতি ফিরল। শেষে তারা ডাকাতি ছেড়ে বংশীদাসের দলে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত। স্বয়ং কেনারাম খোল বাজাত।

প্রাচীন কাব্যের ছন্দ

এইবার মনে রাখতে হবে সেকালের বইপত্র সব পদ্যে লেখা হোত। কেননা, পদ্য তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, গান করা যায়, শুনতেও ভালো। সাধারণত তিন রকম ছন্দের পদ্যই বেশি চলত। তার মধ্যে পয়ার নামের ছন্দই সবচেয়ে বেশি।

যে-ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দোটি ক'রে মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রার পর একটি যতি বা বিরাম থাকে, তাকে বলে পয়ার।

যেমন—

১. কলির ব্রাহ্মণ আর। বলির ছাগল।
ভালোমন্দ জ্ঞান নাই। প্রশ্রয় পাগল॥

পয়ার ছাড়া অন্য তুটি প্রধান ছন্দের নাম লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী। যথাক্রমে উদাহরণ দেওয়া গেল—

২. চিনিতে না পারি না করো চাতুরী
বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয়
তোমার শাশুড়ী আমি॥ (লঘু ত্রিপদী)

৩. কহেন বেহুলা সতী করো বীর অবগতি
মোর সম নাই অভাগিনী।
সায় সদাগর পিতা অমলা আমার মাতা
মোর নাম বেহুলা নাচনী॥ (দীর্ঘ ত্রিপদী)

এই তুটি দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বোঝা যাবে যে, ত্রিপদী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিনটি করে পদ থাকে; লঘু ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় ও আট এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা আট, আট ও দশ। এই রীতিতে বিচার করলে বোঝা যাবে, পয়ার ছন্দও আসলে দ্বিপদী; তার প্রথম পদে আট মাত্রা ও দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা।

এই তিন রকম ছন্দই প্রাচীন বইয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আরো তু-একরকমের ছন্দ সেকালে ছিল, তাতে রচিত পদ্যের সংখ্যা একেবারেই কম।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

দেবতার উদ্দেশ্যে পদ্যে রচিত বইগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলে। বাংলায় নানারকম. মঙ্গলকাব্য আছে। তার মধ্যে যেগুলি খুব প্রসিদ্ধ সেগুলির কথাই বলব। এই সব বইয়ে এক-এক দেবতার মহিমাবর্ণনা আর স্তবগান করা হয়েছে। কিন্তু "এই স্তবগানের লক্ষ্য যে-দেবতা সে নিষ্ঠুর, সে ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের জন্য সে সব অপকর্মই করতে পারে। মানুষ তখন যেসব আকস্মিক বিপৎপাতের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তারই অকারণ হিংস্রতায় দেবতার কল্যাণরূপ তার মনে জাগতে পারেনি। দেবতার স্বভাবের মধ্যে সে যথেচ্ছাচারের প্রবলতা দেখেছে। এই নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে একান্ত হীন করেই তবেই পরিত্রাণের পথ কল্পনা করতে পেরেছে। এ তার আনন্দের পূজা নয়, সগৌরব আত্মনিবেদন নয়, ভীরুতার আত্মাবমাননা।"

মানুষ সংসারে বাস করে পরিবারের অনেক লোক নিয়ে। প্রকৃতির নিয়মে তার মধ্যে রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি এসে দেখা দেয়, তাতে হয় সবারই অশান্তি। কাজেই যে-দেবতা পরিবারের মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটান, তাঁকে খুশি করতে পারলেই সব দিক দিয়ে ভালো হয়। পারিবারিক এই দেবতাটি হচ্ছেন চণ্ডীদেবী। তিনি মঙ্গল করুন এই ছিল মানুষের মনের কামনা, তাই তাঁকে বলা হয় মঙ্গলচণ্ডী। আসলে চণ্ডী মানে হচ্ছে অত্যন্ত কোপনস্বভাবা নারী। এই চণ্ডীদেবীর চরিত্র অবলম্বন ক'রে অনেকগুলি কাব্য অনেকে লেখেন। আগেই বলেছি এই জাতীয় কাব্যগুলিতে দেবদেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে মাহাত্ম্যের যে-আদর্শ, তাতে আত্মার যথার্থ মহিমা নেই। তখনকার দিনের ঐতিহাসিক অবস্থার প্রভাবেই এ রকম হয়েছিল। কেননা, তখন শক্তিশালীর পরিচয়ই ছিল তার যথেচ্ছাচারে। সে-সময়ে প্রায়ই সমাজে যে নিচে আছে, সে হঠাৎ উপরে উঠেছে, উপরের মানুষ নিচে

নেমেছে। এই ওঠানামার মধ্যে নানা অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা যায়। এর থেকে কবি যে-দেবতার রূপ করেছেন, তিনিও ধর্মের রক্ষয়িত্রী নন, তিনি খামখেয়ালী। আজ যার উপরে প্রসন্ন, কাল তার উপরে অকারণে ও অন্যায়রূপে বিমুখ। যে-শিবকে কল্যাণময় ব'লে মনে করা যেত, তাঁর ক্ষমতা নেই। বস্তুত তখনকার শাসনব্যাপারে হীন চক্রান্তকারীদেরই প্রভাব প্রবল হোত। দেবকাহিনীতে আগাগোড়া সেই কলঙ্কেরই ছাপ পড়েছে।

এই ভূমিকা থেকেই চণ্ডীকাহিনীর মূল প্রকৃতিটা বোঝা যাবে। এবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটা বলা যাক। এই কাহিনীর দুটো ভাগ। প্রথম ভাগে কালকেতু ব্যাধের গল্প, আর দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের গল্প। সুতরাং প্রথমেই বলছি কালকেতুর গল্প।

চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী

১. কালকেতুর গল্প

ধর্মকেতু ব্যাধ। তার স্ত্রীর নাম নিদয়া। দুইজনেই চণ্ডীর ভক্ত। চণ্ডীর কৃপায় তাদের একটি ছেলে হোলো।

"উঙা উঙা করে সুত দুইজনে হর্ষ যুত
নিদয়ার সফল মানস,
সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।
অপরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে
ষষ্ঠীপূজা একুশে, করিল একমাসে।
দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু করয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে খেলে ব্যাধবালা॥

গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমায়ু হেতু।
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
বাড়ি বাড়ি ফিরে শিশু নাহি করে ডর ॥

কালকেতুর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল।

নাক মুখ চক্ষু কান কুঁদে যেন নিরমান
দুই বাহু লোহার সাবল,
রূপগুণ শীল বড়া বাড়ে যেন শালকোঁড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।
বুকে শোভে ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাঙা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী
বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলি।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে শশারু তাড়িয়া ধরে
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বেঁধে লতায় জড়ায়া বাঁধে
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।

ছেলে ক্রমে ক্রমে বড়ো হতে লাগল, তখন ধর্মকেতু :

পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ,
কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস—
এতেক বলিল ব্যাধ সোমাই চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে।

সোমাই হচ্ছেন ব্যাধদের ঘটকঠাকুর।

অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন ঝাট,
সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট।

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ,
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদসরসিজ।

সঞ্জয়ের মেয়ে ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিয়ে ঠিকঠাক করে সোমাই ওঝা ফিরে এলেন। বর কনের দুই বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল।

কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি দেয় ব্যাধ সীমন্তিনী
নিদয়ার মানস সফল।

বিয়ে করে কালকেতু ঘরে এল।

অর্জুন সমান ধীর কালকেতু মহাবীর
দেখি সুখী হৈল ধর্মকেতু।
নিদয়ার সুখ বড়ো গৃহকর্মে বধূ দড়
কুলযশ রক্ষণের হেতু।
নিদয়া বসিয়া থাটে, মাংস লয়ে গোলাহাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ি যেমতি ভনে সেইমতো বেচে কেনে
শিরে কাঁথে মাংসের পসরা।
তনয়ে বাগুরা জাল সমপিয়া বহুকাল
ভুঞ্জে সুখ কিরাতনন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীরখণ্ডদধিমধু
নিদয়ার সফল জীবন।
মুক্তিপথে দিয়া মন শিব চিন্তে অনুক্ষণ
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান,
জায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল প্রস্থান॥

বাপ মা চলে গেলে কালকেতু আর ফুল্লরা ঘরসংসার করতে লাগল। কিন্তু তারা বড়োই গরিব। রোজ আনে রোজ খায়। তার ওপর আবার কালকেতু ছিল খাইয়ে লোক। সে খেতে ব'সে :

মুচড়িয়া দুই গোঁফ বাঁধি লয় ঘাড়ে,
একশ্বাসে দশ হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মসুর সুপ মিশাইয়া লাউ।

এই রকম তার খাওয়া। এক-একদিন সে ফুল্লরার খাবার পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। ফুল্লরা থাকত উপোসী। যত দুঃখকষ্টই হোক না কেন স্বামী-স্ত্রীতে তাদের মনে মনে খুব মিল ছিল। সেইজন্যে তারা কোনোরূপ দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্যই করত না। একদিন :

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চাড়া
খর ক্ষুর কাছে তিন বাণ।
শিরে বাঁধা জালদড়ি কর্ণে স্ফটিকের কড়ি
মহাবীর করিল পয়ান।

শিকার করতে বনে চলল কালকেতু। বনে ঢুকতেই সোনালী রঙের একটা গোসাপ তার চোখে পড়ল। গোসাপ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ মনে ক'রে :

স্থবর্ণ গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে,
দেখিলু মঙ্গল যত সকলি হৈল হত
দৈবে দুঃখ দেয়, সব শুনে।

সেদিন আর শিকারে কিছু জুটল না।

কংস নদীর জলে বীর করি' স্নান,
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান।

পথে যায় মহাবীর খায় বনফল
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল।
দুখিনী ফুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে,
কী বলিয়া দাঁড়াইব ফুল্লরার পাশে।
দুঃখ ভাবিয়া বীর চলে পথে পথে
চিন্তায় মলিন চিত্ত ধনুঃশর হাতে।
ধড়ার আঁচলে মোছে নয়নের নীর
কাঞ্চন গোধিকা পুন দেখে মহাবীর।
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জন
তোমারে পোড়ায়ে আজি করিব ভক্ষণ।
যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ।
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলু বড়ো দুখ॥
এমতি যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া
বাঁধিল গোধিকা বীর জাল দড়ি দিয়া।
ধনুকের হুলে হেম গোধিকা টাঙিয়া
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া॥

ফুল্লরা নাহিক বাসে আখেটী অন্নের আশে
পড়শীরে জিজ্ঞাসে বারতা
পড়শী বারতা বলে বীর গেল হাটে চলে
দূর হৈতে দেখিল বনিতা।

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়,
আজি মহাবীর, বলো সম্বল উপায়?

কালকেতু উত্তর করল :

গোধিকা বেঁধেছি, বাঁধি দিয়া জালদড়া।
ছাল উতারিয়া প্রিয়া, করো শিকপোড়া।

—তুমি তোমার সখীর কাছ থেকে কিছু খুদ ধার করে আনো, আমি গোলাহাট থেকে চার কড়ার নুন কিনে আনি।

তখন ফুল্লরা গেল খুদ ধার করতে। কালকেতু গেল নুন আনতে। ওই যে গোসাপ, ওটি কিন্তু আসলে গোসাপ নয়। উনি স্বয়ং চণ্ডী। কালকেতুর প্রতি সদয় হয়ে তার ঘরে এসেছেন।

হুংকারে ছিঁড়িয়া দড়ি পড়িয়া পাটের শাড়ি
যোলো বৎসরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা।
সর্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক অঙ্গদ বলয় শঙ্খ
বাহুবিভূষণ সুশোভন
সকল অঙ্গুলি ভরি মানিকের অঙ্গুরি
দন্তরুচি ভুবনমোহন।

সখীগৃহে খুদসের করিয়া উধার
সত্বরে ফুল্লরা চলে কুঁড়ের দুয়ার।
বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি
কুঁড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী।
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা,
কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্যভাষা,
হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস
ফুল্লরারে অভয়া করেন পরিহাস।
শুনগো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী
আইলু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।

তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি
এইস্থানে কতদিন করিব বসতি ॥

দেবী 'গুণে বাঁধা' মানে ধনুকের গুণে বাঁধার কথা বললেন। কিন্তু ফুল্লরা বুঝলেন উলটো। মনে করলেন মেয়েটি বুঝি তার স্বামীর বীরত্বে রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। তাই তাঁকে তাড়াবার জন্যে :

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী,
ভাঙা কুঁড়েঘর তালপাতার ছাউনি।
কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ,
দরিদ্র হইল স্বামী, বিধাতা বিমুখ।

কিন্তু দুঃখের কথাতে চণ্ডী টললেন না।

বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী।
কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন,
গোলাহাটে বীরপাশে দিল দরশন।

কালকেতুকে বলল :

পিঁপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে,
কাহার রূপসী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী
পরস্ত্রীকে দেখি যেন নিদয়া জননী।
পসরা চুপড়ি পাখি লইল ফুল্লরা,
চলিলেন গোলাহাটের তুলিয়া পসরা।
দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির কেটেছে যেন তপন তরাসে।

কালকেতু প্রণাম করে বলছে :

আমি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি বামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
কিবা দেব দ্বিজকন্যা ত্রিভুবনে এক ধন্যা
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু।

এখানে থাকা তোমার উচিত নয়। চলো আমরা দুজনে তোমাকে তোমার বাড়ি রেখে আসি। দেবী এতে কোনো কথাই কইলেন না।

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী,
ঈষৎ কুপিত বীর বলে জোড়পাণি।
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার,
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার।
ছাড়ো এই স্থান রামা ছাড়ো এই স্থান,
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।
এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর।
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ,
হাতে শর রহে যেন চিত্রের সমান।
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর।
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন
হতবলবুদ্ধি হৈল আখেটী নন্দন।
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁপর।
শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে

আমি চণ্ডী, আইলাম তোরে দিতে বর
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর।

দেবী তাকে মানিকের আংটি আর সাতঘড়া মোহর দিয়ে বললেন :

মানিক অঙ্গুরি সপ্ত নৃপতির ধন
ভাঙাইয়া কাটো গিয়া গুজরাটের বন।
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গোরু ধান
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান।
শনি কুজ বারেতে করিহ মোর জাত,
গুজরাট নগরের হইবে তুমি নাথ।

কালকেতু কলিঙ্গরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করল। পরে চণ্ডীর দয়ায় :

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা,
আর যত ভুঞা রাজা করে তার পূজা।
কোনো রাজা সম নহে করিতে সমর,
পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল কতকালে,
গুজরাটে রাজ্যভোগ করে কুতূহলে॥

২. ধনপতি সদাগরের গল্প

এইবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় গল্পটি আরম্ভ করা যাক :

উজানী নগর অতিমনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানীর রাজা
কৃপা কৈল দশভুজা॥

এই নগরে ধনপতি সদাগর বাস করেন। তাঁর খুব টাকাকড়ি। স্ত্রী ছিল দুটি। বড়োটি লহনা ছোটোটি খুল্লনা। খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত,

চণ্ডীর পূজা করেন। কিন্তু, সদাগর আর লহনা চণ্ডীকে মানেন না। একবার সদাগর সিংহলে চলেছেন বাণিজ্য করতে। খুল্লনা তাঁর পথের মঙ্গল কামনা করে চণ্ডীপূজা করছেন। এমন সময় লহনা গিয়ে সদাগরকে বললেন :

সদাগর, তোমায় আমায় আছে বিরল কথা
তোমার মোহিনীবালা শিক্ষা করে ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।
হেমঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্বা
অষ্টশালি তণ্ডুল উপরে।
সিন্দূর চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী দিয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥

এই কথা শুনে :

সাধু—আগে চলিল লহনা নারীজন
পশ্চাতে চলিল সাধু, বেনের নন্দন।
পূজাগৃহে উপনীত হৈল ধনপতি
জয় দিয়া পূজা করে খুল্লনা যুবতী।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
ঘর হৈতে ধনপতি করিল গমন,
উভরায় খুল্লনা সে করেন ক্রন্দন।
পথে যাইতে সদাগরের লাগিল উচোটা,
নেতের আঁচলে লাগে শেয়াকুল কাঁটা।
সবাকারে গাবী ঘর করি সমর্পণ
নৌকায় চড়িল, করি শিবের স্মরণ।

সদাগর বাণিজ্যে চলে গেলেন। তখন লহনা খুল্লনাকে বড়ো কষ্ট দিতে লাগলেন। খুল্লনা আবার তখন গর্ভবতী। চণ্ডীকে স্মরণ ক'রে খুল্লনা সবই সইতে লাগলেন। যথাসময় :

প্রসবে খুল্লনা নারী পূর্ণ দশমাসে
হইল তনয়, রূপে দিন পরকাশে।

ছেলেটির নাম শ্রীমন্ত এবং শ্রীপতি রাখা হোলো।

দিনে দিনে বাঢ়য়ে শ্রীপতি
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া নাহি রোগ নাহি পীড়া
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতি।

এদিকে ধনপতি সমুদ্রের মাঝে কালীদহ ব'লে একজায়গায়, চণ্ডীর মায়ায় এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। সমুদ্রের ওপর মস্ত এক পদ্মবন। তার মাঝে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ব'সে। সে একটি হাতি নিয়ে একবার গিলছে আর একবার উগরে ফেলছে। সদাগর তো অবাক।

যথাসময় সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা শালবানের কাছে সব কথা বললেন :

কালীয়দহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা ॥
সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে ॥
সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন
লুটিয়া লইবে মোর বহিত্রের ধন ॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে
দেখাইতে নারি যদি কামিনী কুঞ্জরে ॥

রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধসিংহাসন ॥
অপরূপ কথা শুনি শালবান নৃপমণি
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনি পুরে ধায় সর্বজনা ॥

সকলে কালীদহে গেলেন। চণ্ডীর মায়ায় কমলে কামিনী দেখা গেল না। রাজা খুব চটে গেলেন। কালু আর নিশীশ্বর নামক দুজন সেপাইকে হুকুম দিলেন—বাঁধো সদাগরকে।

নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে কালুনিশীশ্বরে
ঢেকা মারি সদাগরে লয় কারাগারে।

বারো বছরের মতন সদাগর কারাগারে গেলেন। চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে আসার ফল ফলল।

এদিকে উজানী নগরে শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে উঠছেন। পাঠশালায় যাচ্ছেন।

পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রিদিন করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মন পড়ে লিখে অনুক্ষণ,
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥

অধ্যাপকের নাম জনার্দন ওঝা। লোকে তাঁকে দনাই ওঝা বলত। তাঁর সঙ্গে একদিন শ্রীমন্তের তর্ক হোলো। ওঝা শেষে না পেরে, শ্রীমন্তের বাপ যে সিংহলে বন্দী হয়ে আছেন, এই কথা নিয়ে তাকে খোঁটা দিলেন। শ্রীমন্ত ভয়ানক চটে গেলেন।

কোপে কাঁপে কলেবর চলিলা শ্রীপতি।
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিলা প্রণতি ॥

বাড়ি গিয়ে মাকে বললেন :

দনাই পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে
কোন্ কালে মৈল ধনপতি।
মায়ের আয়তি হাতে ভোজন আমিষ ভাতে
মিথ্যা হিন্দু কুলেতে উৎপত্তি॥
হের আইস বড়োমাতা কহি কিছু দুঃখকথা
দেহ মোরে যত চাহি ধন।
বাপের উদ্দেশ আশে চলিব সিংহল দেশে
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥

অনেক ক'রে ব'লে-কয়ে শ্রীমন্ত সিংহলে গেলেন—বাপের উদ্দেশ্যে।

আরোপিয়া হেমঘটে ভ্রমরা নদীর তটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
'আরোপিয়া পদছায়া শ্রীমন্তে করো গো দয়া
পুরাও হে দাসীর বাসনা।'

শ্রীমন্তের মঙ্গল কামনা করে খুল্লনা রোজই চণ্ডীর পূজা করেন। শ্রীমন্তও পথে যেতে তার বাপের মতো কালীদহে কমলে কামিনী দেখতে পেয়ে সিংহলে গিয়ে রাজার কাছে বললেন।—রাজা বিশ্বাস করলেন না। রাজা বললেন :

রাজসভাযোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্মশাস্ত্র বিধানে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে মিথ্যা যদি আমার বচন
লুটিয়া লইও সাত বহিত্রের ধন॥
দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন
অবধানে শুন রাজা মোর নিবেদন॥

রাজা বলে সত্য যদি তোমার বচন
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন ॥
নিজ কন্যা দিব দান ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভাবিদ্যমান ॥
রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসিপত্রে লিখিত করিল সভাজন ॥

কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্রীমন্তও রাজাকে কমলে কামিনী দেখাতে পারলেন না। রাজা শ্রীমন্তের সাত ডিঙা লুটে নিয়ে দক্ষিণ মশানে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। শ্রীমন্ত প্রাণদণ্ডের পূর্বে এক মনে ভক্তিভাবে চণ্ডীর স্তব করতে লাগলেন। চণ্ডীর দয়া হোলো। তাঁর ভূতপ্রেত এসে রাজার সৈন্যসামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তাদের হারিয়ে দিল। চণ্ডী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তার মেয়ে সুশীলাকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে নইলে মঙ্গল নেই। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাই করলেন, শ্রীমন্ত ধনপতিকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনলেন। শেষে সকলেই আবার চণ্ডীর ইচ্ছায় কমলে কামিনী দেখতে পেলেন। ধনপতি ছেলে বউ নিয়ে দেশে ফিরে এসে ধুমধাম করে চণ্ডীর পূজা করলেন। শিশুকাল থেকে ধনপতি প্রাণপণে যে-দেবতার পূজা করেছেন এই ভাবে তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই হোলো চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় গল্প। আমরা কেবল কাব্যগুলির মূল ঘটনাটাই বলে যাচ্ছি। বইয়ে কিন্তু আরো অনেক কথা আছে।

মানিকদত্ত, মুক্তারাম সেন, ভবানীপ্রসাদ, কমললোচন, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীর কাব্য লিখেছেন। সবচেয়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী— কবিকঙ্কণের বইখানিই প্রচলিত বেশি। এখানির বর্ণনা প্রভৃতি খুব সুন্দর।

এইসব কাব্যকথার কী করে প্রচার হোত, সে-কথা একটু বলি।

তখনকার যুগে বই-ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই হাতে লিখে বই নকল করে নিতে হোত। বড়ো বড়ো বই নকল করে নেওয়া সোজা কথা নয়। যদিবা নকল করা হোলো, তাহলে সেই একখানা বই নিয়ে টানাটানি ক'রে অনেকে পড়তে গেলে বইখানির যা দশা হয় তা তো বোঝাই যায়। দিশি কাগজে আর তালপাতায় বই লেখা হোত।

এইসব কাব্যকথা লোকে জানতে পেত গানের মধ্যে দিয়ে। এক-একজন বই আগাগোড়া মুখস্থ করে রাখতেন। তিনি আরো দু-দশ জন লোক জুটিয়ে, বাজনা বাদ্যি নিয়ে একটা গানের দল তৈরি করতেন। যেখানে গান হোত সেখানে শতশত স্ত্রী-পুরুষ শুনতে আসত। যিনি প্রধান গায়ক (মূলগায়েন), তিনি এক-এক পংক্তি সুর করে গান করেন। আর তাঁর দলের লোক সেই পংক্তিটা আবার ফিরে গান করে। এমনি করে এক-একটা পালা শেষ হয়। এতে একসঙ্গে শতশত লোক গান শোনে, কখনো আনন্দে হাসে আর কখনো দুঃখে চোখের জল ফেলতে থাকে। এমনি করেই আমাদের দেশে সেকালে সকলে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিরও কথা জেনেছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

মনসার কথা আর চণ্ডীর কথা বললাম। এইবার ধর্ম ঠাকুরের কথা বলব।

আমাদের দেশে একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। তখন বৌদ্ধদের অনেক আচার-বিচার দেব-দেবতা ব্রাহ্মণ্য বা সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে ঢুকে তদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধরা স্বয়ং বুদ্ধদেব ছাড়া তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও তাঁর সৃষ্ট সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বা সংঘের প্রতিও আনুগত্য স্বীকার করতেন।

কালক্রমে বৌদ্ধসংঘ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং বৌদ্ধধর্মও সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গেল; তখন স্বয়ং বুদ্ধদেবও ধর্মঠাকুর নামে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। এই ধর্মঠাকুর কখনো শিব কখনো বা বিষ্ণুর আর অন্যান্য গ্রাম্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম ব'লে গণ্য হয়েছেন। এই ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে কাব্য তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ আর ময়ুর ভট্টের ধর্মপুরাণ বেশ নামকরা বই। এই বই দুটিতে কী করে ধর্মঠাকুর হলেন, তাঁর পূজা কী করে করতে হয়, এইসব কথা লেখা। ধর্মঠাকুরের আর-এক নাম নিরঞ্জন। কাজেই নিরঞ্জনমঙ্গল ধর্মমঙ্গল একই বিষয়ে লেখা।

ধর্মমঙ্গল কাহিনী

মেদিনীপুর জেলায় ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন। তিনি গৌড়ের রাজার অধীন। অজয় নদের তীরে ঢেকুর ব'লে একটা জায়গা। সেখানে সোমাই ঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ ক্রমে ক্রমে এমন প্রতাপ-শালী হয়ে উঠল যে গৌড়ের রাজাকে পর্যন্ত ভয় করত না। ইছাই ঘোষ জাতে গোয়ালা, শ্যামরূপা নামে কালীর ভক্ত, আর কালীর বরে সে অমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল।

কর্ণসেন তার সঙ্গে পেরে উঠতেন না। অবশেষে তিনি গৌড়ে গেলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

দরবারে বসিয়া আছে গৌড়েশ্বর রায়
কর্ণসেন রাজা দেখা করিবারে যায়।
রাজার দরবারে সেন কাঁদিতে লাগিল।
এতদিনে মহারাজ রাজ্য দেশ গেল।

ইছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে
আপনে আছেন দুর্গা ইছাইয়ের ঘরে।
আজি কালি হানা দিবে গৌড় উপরে
এত শুনি গৌড়েশ্বর রুষিলা অন্তরে।

তখন গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে ইছাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। উভয়ের যুদ্ধ হোলো। সেই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় ছেলে মারা গেল। তিনি হেরে ফিরে গেলেন।

বাসঘরে উপনীত হৈল মহীপতি
কর্ণসেনের পাটরানী নাম শিলাবতী।
রানীর নিকটে সেন কাঁদিতে লাগিল—
ছয়পুত্র তোমার সমরে যুঝে মল্যো।
শিলাবতী পুত্রশোকে কাঁদিয়া পাগল।
জীবন তেজিল রানী খায়া হলাহল।
কর্ণসেন বলে আমি ঘরে না রহিব,
উদাসীন হয়্যে আমি বৃন্দাবন যাব।
দেখিব মথুরা কাশী দ্বারকা ভুবন
পুত্রশোকে উদাসীন হইলা রাজন।
মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী
গৌড়েশ্বর নৃপতিকে দেখা করে আসি।

কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কর্ণসেন কাঁদিল রাজার বিদ্যমানে
গৃহশূন্য বিধাতা করিল এতদিনে।
রাজ্য লইয়া ইছাই গোয়ালা রাজা হোলো
পুত্রশোকে পাটরানী শিলাবতী মল।

উদাসীন হয়ে যাই তুমি আজ্ঞা দিলে
রাজা বলে—কর্ণসেন, অবোধ হইলে।
বৃদ্ধক দশাতে কোথা হবে দেশান্তরী
ঘরে বস্যা কৃষ্ণ ভজ মন দৃঢ় করি'।
কর্ণসেনে প্রবোধিয়া রায় গৌড়েশ্বর
দরবার হতে রাজা চলিলা সত্বর।
ভানুমতী পাটরানী পরম সুন্দরী
কাছে বসে ছোটো বোন রঞ্জা বিদ্যাধরী

এই রঞ্জাবতীকে দেখেই রাজা মনে করলেন, আমার জন্যেই যুদ্ধ করে কর্ণসেনের অমন দশা হয়েছে সুতরাং এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কর্ণসেনকে আবার সংসারী করব।

রানীর সহিত রাজা যুক্তি আরম্ভিল
এই কন্যা কর্ণসেনে বিভা দিতে হোলো।

কর্ণসেন তখন বুড়ো থুড়থুড়ে। রঞ্জাবতীর ভাই মহামদ চা'ন তাকে ভালো ঘরে ভালো বরে দিতে। মহামদ আবার গৌড়েশ্বরের সেনাপতি। গৌড়েশ্বর কৌশলে মহামদকে অন্য দেশে পাঠিয়ে, রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। রঞ্জাবতীর মা বাবা অবশ্য জানলেন। প্রবল প্রতাপ জামাইকে কিছু বলতে পারলেন না। মহামদ বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তাঁর মা তাকে সমস্ত খবর দিলেন।

বৃদ্ধ রানী বলে বাছা ছিলে নাই ঘরে
রাজা বিভা দিল তার কর্ণসেন বরে।
হুংকার ছাড়িয়া পাত্র বলে হায় হায়
এ তাপ বাপের পুত্রে সহা নাহি যায়।

মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা
কার বুদ্ধ্যে বাবা এত পেয়েছে লঘুতা।
রাজা সে রাজ্যের কর্তা জেতের সে কে
বৃদ্ধ হোলে বুদ্ধি নাশে ভয়ে ভুলে সে।
ভালো মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হতে মল।

মহামদ বাপকে বলছেন :

দেবকী হৈল রঞ্জা, উগ্রসেন তুমি
সবংশ করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।
এত বলি' মহাপাত্র মুচড়িছে দাড়ি
রায় কর্ণসেনে বড়ো বেড়ে গেল আড়ি।

মহামদ রঞ্জাবতীকে স্বামীর ঘর করতে মানা করলেন। রঞ্জাবতী সে-কথা শুনলেন না। তাই রঞ্জাবতীরও ওপরে ভারি চটে গেলেন।

রামাই পণ্ডিতের উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা ক'রে এক মহাবীর পুত্র পেলেন। তার নাম রাখলেন লাউসেন।

মহামদ লাউসেনের নানারকম অনিষ্ট করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধর্মের কৃপায় তাঁর কিছুই করতে পারলেন না। অবশেষে গৌড়েশ্বরকে কুমন্ত্রণা দিলেন, তিনি ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাউসেনকে আদেশ করলেন। লাউসেনের সেনাপতি কালুডোম। তার সহায়তায় ভীষণ যুদ্ধ হোলো। কালুডোম যুদ্ধে মরে গিয়েও ধর্মঠাকুরের বরে বেঁচে উঠল।

গোয়ালা হানিল চোট, সামালিয়া বীর
অমনি উলটি হানে ইছাইয়ের শির।

লাউসেন ইছাই ঘোষের মাথা কেটে ফেললেন।

নির্ভয় হৈল পুরী জয় হৈল রণ।
পরম পিরীতি পাইল প্রভু নিরঞ্জন॥

কেউ জয় করতে পারেনি ব'লে যে ঢেকুরের নাম ছিল অজয়, আজ লাউসেন তা জয় করে দেশে ফিরলেন। ধর্মের মহিমায় চারদিকে জয় জয় রব উঠল।

আজও অজয়ের তীরে ইছাই ঘোষের দেউল আর শ্যামরূপার গড় (কেল্লা) প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

এই কাহিনী অবলম্বন ক'রে ধর্মমঙ্গল-কাব্য অনেকেই লিখেছেন। তার মধ্যে মানিক গাঙুলি আর ঘনরাম চক্রবর্তীর পুঁথি দুইখানিই বেশি প্রচলিত।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

বসন্ত রোগের দেবতা শীতলা দেবী। বৌদ্ধযুগে এঁকে হারিতী বলত। এঁর মাহাত্ম্যের কথা আছে শীতলামঙ্গলে। শীতলাদেবীর বিদ্বেষী চন্দ্রকেতু পরে শীতলার ভক্ত হয়ে তাঁর পূজা প্রচার করেন।

দুর্গার বিষয়ে ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল প্রসিদ্ধ কাব্য। দুর্গার জন্ম, বিবাহ, ঘরসংসারের কথা, শিবের সঙ্গে ঝগড়া প্রভৃতি এতে লিখিত হয়েছে। সমস্ত জীবকে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য দেন ব'লে দুর্গা অন্নদা। এই ভারতচন্দ্রের বইখানি ইংরেজরাজত্বের সূচনাকালে লেখা। আগেকার কবিদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। দুর্গামঙ্গল, সারদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল দুর্গারই কথায় বর্ণিত।

গঙ্গামঙ্গলে গঙ্গার কথা, কৃষ্ণমঙ্গলে কৃষ্ণের কথা, চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের কথা। এইরকম অনেকের সম্বন্ধে মঙ্গল-কাব্য বাংলায়

আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি একঘেঁয়ে রকমের বর্ণনায় ভরা। লোকের মঙ্গলের জন্যে আর মঙ্গলবার থেকে গান আরম্ভ হোত বলে নাকি এই সব কাব্যের নাম "মঙ্গল"।

নাথ-সাহিত্য

এইবার মঙ্গল-কাব্য বাদে অন্য ধরনের দুখানা কাব্যের কথা বলব। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মকে মিশিয়ে একটা ধর্মমত গড়ে উঠেছিল। সেই ধর্মকে যোগিধর্ম বা নাথধর্ম বলত। এই ধর্ম এখনো বর্তমান আছে। এককালে এই যোগিধর্মে বাংলাদেশ ছেয়ে যায়।

এই ধর্মের সন্ন্যাসীরা নিজেদের নামের শেষে 'নাথ' শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন— মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি। এইজন্য এই ধর্মসম্প্রদায়কে নাথসম্প্রদায়ও বলা হোত।

এই ধর্মের প্রভাব এখন বাংলাদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাঙালিরা নিজেদের নামের সঙ্গে পুরোনো স্মৃতিটুকু বহন করছে— নামের শেষে 'ইন্দ্রনাথ' যোগ ক'রে। যেমন—সুরেন্দ্রনাথ, মুনীন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

এতেই বোঝা যায় এই নাথসম্প্রদায় আমাদের দেশে কী রকমভাবে জমে বসেছিল। অনেকে মনে করেন চৌরঙ্গীনাথের নামে কলকাতার ওই বড়ো রাস্তাটারই নামকরণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে 'যুগী' নামে যে-জাত তা এই সম্প্রদায় থেকে উৎপন্ন। যাই হোক এই নাথধর্মের অনেক বই হিন্দু ও মুসলমানে লিখে গিয়েছেন।

১. গোরক্ষবিজয় কাহিনী

নাথ-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু মীননাথ। তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ। তাঁরা দুজনেই সিদ্ধপুরুষ, অলৌকিক ক্ষমতাশালী।

'শুন শুন কহি সবে গোরক্ষবিজয়।
হইলে পণ্ডিত, লেখো মনে যদি লয়।
একদিন হরগৌরী একত্রে বসিল
শিবের চরণে দেবী কাঁদিতে লাগিল।
কোন্ যুগে জিয়ে প্রভু কোন্ যুগে মরি
হেন তত্ত্ব কহ প্রভু, যুগে যুগে তরি।

এই তত্ত্বের নাম মহাজ্ঞান। এই মহাজ্ঞান জানলে জন্মমৃত্যুর সমস্ত রহস্য জানা যায়। এমন কি, মরাকেও বাঁচানো যায়।

দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর
ত্বরিতে চলহ প্রিয়া ক্ষীরাম্বু সাগর।
সাগরের মাঝে আছে টঙী মনোহর
এ বলিয়া দুইজনে চলিলা সত্বর।
মহেশ্বর বলে দেবী শুন সাবধানে
যতেক পরম তত্ত্ব কহি তোমা স্থানে।

নির্জনে শিব পার্বতীকে এই পরম তত্ত্ব শোনাচ্ছেন। পার্বতী কিন্তু ঘুমিয়ে পড়িলেন। সেইখানে জলের নিচে মীননাথ তপস্যা করছিলেন। তিনি সব মহাজ্ঞান শিখে ফেললেন।

ধ্যানেতে জানিল হর যে শুনিল মীন
হর বলে হইবেক নারীর অধীন।
ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব বলিল বচন
যে শুনিলা এইখানে, হৈবা বিস্মরণ।

নির্জনে স্ত্রীর সঙ্গে যে-আলাপ শিব করছেন, যোগী হয়ে মীননাথ তা চুরি করে শুনলেন। তাই শিব শাপ দিলেন মীননাথের সন্ন্যাসধর্ম যাবে, তিনি গৃহস্থ হয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করবেন।

যাই হোক মীননাথ তো সেখান থেকে বেরিয়ে দেশে দেশে ধর্মপ্রচার

করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মহা প্রভাব। কিন্তু পার্বতী শিবকে বললেন :

যদি আজ্ঞা করো হর, করি নিবেদন,
এই সব ভোলাইব আমি করিয়া রচন।
দেবি এ করিল মায়া নানামতো ছলে
বিষম সংকট মায়া মুনি মন টলে।
মীননাথ পড়িলেক কদলীর ভোলে।

দেবীর মায়ায় মীননাথ আর তাঁর সন্ন্যাসীর দল সংসারী হয়ে গেলেন। মীননাথ গেলেন দক্ষিণ দেশে কদলীপত্তনে। সেখানে তিনি রাজা হলেন। রানী চাকরানী লোকলস্কর নিয়ে খুব ধুম করে রাজত্ব করতে লাগলেন। মহাজ্ঞান ভুলে গেলেন। গোরক্ষনাথকে দেবী ভোলাতে অনেক চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

হেনকালে ভবানী ভাবিল নিজকাজ
আহ্মিহ না পারিলাম গোর্ক্ষে দিতে লাজ।

কাজেই গোরক্ষনাথই জয়লাভ করলেন। কদলীপত্তনের রানীরা টের পেলেন মীননাথ একজন যোগী। তাই যোগী দেখে যদি ইনি উদাসীন হয়ে রাজত্ব ছেড়ে চলে যান, এই ভয়ে দেশে যোগীদের ঢোকা নিষেধ করে দিলেন।

যখনে হইল রাজা মীন অধিকারী
ভালোমতে নাহি দেখে যোগী দেশান্তরী।
পরদেশী যোগী পাইলে লইয়া যায় ধরি
দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে ফেলায় মারি।

কাজেই কোনো যোগী সন্ন্যাসী আর সেখানে ঢুকতে সাহস করত না। এদিকে গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে খুঁজতে খুঁজতে টের পেলেন, গুরু কদলীপত্তনে রাজত্ব করছেন। সেখানে যোগীর ঢোকা বিপদজনক।

অথচ গুরুর সঙ্গে তাঁর দেখা করা চাই। কেননা, গুরু মহাজ্ঞান ভুলে সংসারী হয়ে পড়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করা চাই। গোরক্ষনাথ মনে করলেন তিনি মেয়ে সেজে কদলীপত্তনে ঢুকবেন। গোরক্ষনাথের চেহারা অতি সুন্দর ছিল। তার উপর তিনি নাচতে গাইতে অদ্বিতীয় ওস্তাদ ছিলেন। গোরক্ষনাথ সাজসজ্জা জোগাড় করলেন।

অলংকার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ
একে একে পরিলেক যত আভরণ।
গলায় তুলিয়া দিল সাতছড়ি হার
হস্তেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকার।
কপালে তিলক দিল নয়নে কাজল
কর্ণেতে পরিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি,
গায়েতে কাঁচলি দিল কোমরে কাছুটী,
হেন মতো সাজ কৈল ভুবনমোহন
আছুক অন্যের কার্য মোহে মুনির মন।
মীনের দুয়ারে গিয়া মাদলে দিল হাত
দুই কর্ণ পাতি শুনে রাজা মীননাথ।

রাজবাড়িতে নাচগানের আয়োজন হোলো। রাজা রানী পাত্র মিত্র সবাই শুনতে বসলেন।

লোমাঞ্চিত হৈয়া বসে রাজা মীননাথ
ডিমিকি ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত—
নাচন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে
কায়া সাধো কায়া সাধো মাদলে হেন বোলে

'কায়া সাধো' মানে দেহ দিয়ে ধর্ম সাধনা করো। এই কথাটাই মাদলের বোলের সঙ্গে গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে জানাচ্ছেন।

নাচয়ে গোরক্ষনাথ নূপুর রুনুঝুনু
শুনিয়া যে মীননাথ পুলকিত তনু।

পরে গোরক্ষনাথ নির্জনে মীননাথের সঙ্গে আলাপ করলে মীননাথ তাঁকে চিনতে পারলেন। নিজে সংসার ভোগ করার জন্য লজ্জিত হলেন, কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করতে সাহস করলেন না। তখন গোরক্ষনাথ নানারূপ উপদেশ দিতে লাগলেন।

গোর্খের বচন শুনি ঈশ্বর মিনাই
সম্বোধিয়া শিষ্যপুত্রে কহন্ত বুঝাই।
ভালো কহ যত্র পুত্র যতি-গোরখাই
উলটি সাধিতে যোগ গায় বল নাই।

ক্রমাগত উপদেশ দিয়ে গোরক্ষনাথ গুরুর মন ফেরালেন। শিবের শাপও শেষ হোলো। মহাজ্ঞান আবার ফিরে পেলেন।

জ্ঞান পাইয়া মীনের স্থির নহে মন
রহিতে নারিল ঘরে চলিল তখন।

মীননাথ রাজত্ব ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই বিষয় অবলম্বন করে যেসব বই লেখা হয়েছে, তার কোনোটার নাম গোরক্ষবিজয় বা গোরক্ষসংহিতা, আর কোনোটার নাম মীনচেতন।

২. ময়নামতীর গান

এই ধর্মসম্প্রদায়ের আর-একটা গল্প নিয়ে কতকগুলি বই লেখা হয়। সেগুলি, গোপীচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান অথবা ময়নামতীর গান নামে পরিচিত।

বাংলার রাজা গোপীচাঁদের চরিত্র নিয়ে কাব্যগুলি রচিত। এই গল্পটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ করা হয়। এখনো সেসব দেশে গোপীচাঁদের বিষয় থিয়েটারে দেখানো হয়ে থাকে। অথচ আমরা আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা ভুলে' বসে আছি।

বাংলাদেশে মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্র। তাঁর মেয়ে ময়নামতী। একবার গুরু গোরক্ষনাথ তাঁদের বাড়ি আসেন। ময়নামতীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহাজ্ঞান দেন এবং নিজের শিষ্যা করেন। তাই ছোটোবেলা থেকেই তিনি যোগসিদ্ধা আর জ্ঞানবতী ছিলেন।

বাংলার রাজা মানিকচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হোলো। রাজার আরো অনেক রানী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ময়নামতীর বনত না ব'লে রাজা তাঁকে ফেরুসা নামে এক গ্রামে বসবাস করতে পাঠালেন।

রাজা মৃত্যুর সময় ময়নাকে দেখতে চাইলেন। ময়না এলেন। রাজাকে মহাজ্ঞানের মন্ত্র দিতে চাইলেন, এই মন্ত্র নিলে তাঁর মৃত্যু হবে না। রাজা মানিকচাঁদ বললেন :

ঘরের রমণী স্থানে যে জ্ঞান সাধিমু
গুরু বলি কোন্ মতে পদধূলি লৈমু।
তোমার যে এহি জ্ঞান মোর কার্য নাহি
সব জ্ঞান কহি দিয়ো গুপিচাঁদের ঠাঞি।

গোপীচাঁদ ময়নামতীর ছেলে। গোরক্ষনাথের বরে তিনি তাঁকে পেয়েছেন। মানিকচাঁদ স্ত্রীকে গুরু ব'লে স্বীকার করে মন্ত্র নিতে চাইলেন না। অবশেষে তিনি মারা গেলেন। গোপীচাঁদ এখন রাজা হবেন। কিন্তু তাঁর জন্মের সময় :

পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোঁসাই
গ'নে দেখে আঠারো বৎসর বালকের পরমাই।

আঠারো বৎসর প্রমাই উনিশে মরিবেক,
হাড়িফার চরণ সেবি অমর হইবেক।

এই হাড়িফা ময়নামতীর গুরুভাই। ফেরুসাতে বাসের সময় এঁরা পরস্পর অনেক সময় ধর্মচর্চা করতেন। ময়নামতীর মনে সুখ নেই। এদিকে গোপীচাঁদ রাজ্য পেলেন :

তার পর করিল বিভা হরিশ্চন্দ্র কন্যা
পৃথিবী উপরে সেই গুণে বড়ো ধন্যা।
হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা তার নাম,
শশধর জিনিয়া মুখের অনুপাম।
কন্যার পাত্র দেখে রাজার কৌতুক,
ছোটো কন্যা পদুনা ছিল দিলেন যৌতুক।

ছেলে সংসারে থাকলে উনিশ বছরে মারা যাবে। যদি বারো বছরের মতো সন্ন্যাসী হয়ে যায় তবে আর মরবে না। এ কথা ময়নামতী জানেন। তাই গোপীচাঁদকে বার বার সংসার ত্যাগ করবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। গোপীচাঁদ সম্মত হন তো রানীরা হন না। অবশেষে আসল কথা জানতে পেরে :

মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া
গুরু সঙ্গে যায় রাজা বিদায় হৈয়া।
সন্ন্যাসী হইয়া রাজা গুরু সঙ্গে যায়
একশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে ছ্যায়।

হাড়িফা গোপীচাঁদের ধৈর্য পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে নানা রকম কষ্ট দিলেন, তিনি তাতে অটল রইলেন। বারো বছর বাদে গোপীচাঁদ নিজের বাড়িতে ফিরে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকতে গেলেন। তখন রানীরা চিনতে না পেরে কুকুর লেলিয়ে দিলেন। কুকুর কিন্তু চিনতে

পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল। তখন রানীরাও চিনলেন। মাথার জটা মুড়িয়ে গোপীচাঁদ রাজত্ব করতে বসলেন।

দেশে আনন্দের হাট বসে গেল। গোপীচাঁদের এই সন্ন্যাসের কথা লোকে রামবনবাসের মতো চোখের জল ফেলতে ফেলতে শুনত।

শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় এবং সুকুর মামুদ, ভবানীদাস প্রভৃতি কবিদের রচিত ময়নামতীর গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলির কথা একে একে বলা গেল। দেখা গেল যে প্রত্যেক গল্পই ধর্মের বিষয় অবলম্বন করে লেখা। অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ গল্প আরো অনেক আছে। সেগুলিও এইভাবে কোনো না কোনো লোককে জড়িয়ে ধর্মের বা দেবতার মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ।

আমাদের দেশের হিন্দুরা সাধারণত শক্তি (দুর্গা), সূর্য, গণেশ, শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে কোনো না কোনো দেবতার ভক্ত। এই সব ভক্তেরা নিজের নিজের উপাস্য দেবতার কথা লিখেছেন। দুর্গার বিষয়ে দু-একখানা বইয়ের কথা আগেই বলেছি। সূর্যের কথা নিয়ে সূর্যের গান, গণেশের কথা নিয়ে গণেশমঙ্গল (বাংলায় গণেশের সম্বন্ধে বই খুব কম), শিবের বিষয় নিয়ে শিবের গান বা শিবায়ন আর বিষ্ণুর সম্বন্ধেও কৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণবিলাস প্রভৃতি বই রচিত হয়েছিল।

দক্ষিণ বঙ্গে অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের ভয় খুব প্রবল। তাই সে-অঞ্চলে দক্ষিণরায় নামে এক বাঘের দেবতাও কল্পিত হয়েছে। এই দক্ষিণরায়ের কাহিনী নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম রায়মঙ্গল।

যে সব বইয়ের কথা আগে বলা হোলো সেসব বইয়ে তখনকার রীতি-নীতি সাজসজ্জা খাওয়াপরা প্রভৃতি নানা বিষয়ের খবর পাওয়া যায়। প্রাচীন সব বইয়ে এই রকম বর্ণনা আছে। খাওয়া আর পরা এ দুটো

মানবসভ্যতায় সবচেয়ে দরকারি। তার কিছু এখানে উল্লেখ করলে নেহাত রসভঙ্গ হবে না। সেযুগে মেয়েদের ভালো রান্নাকরার খ্যাতিতে একটা গৌরব ও আত্মপ্রসাদ ছিল যেমন এযুগে বিশ্ববিত্থালয়ের ডিগ্রি লাভে হয়ে থাকে। লক্ষপতি ধনীঘরের গৃহিণীরাও রাঁধতে লজ্জা বোধ করতেন না, তাঁরা স্নান করে "শুচিবাস" পরে একটু সেজেগুজেই হেঁসেলে ঢুকতেন, আর রাঁধতেন কী।

"বাস্তুকশাক পাক করি বিবিধ প্রকার
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর
চৈমরিচ সুক্তা দিয়া আর ফল ফুলে
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড প্রচুর।
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি পুলি পিঠা ইষ্ট। ইত্যাদি

নিরামিষ আর আচার মোরব্বা প্রভৃতি বেশিদিন ট্যাকসই খাবার হচ্ছে—

আমকাসন্দি জামকাসন্দি ঝালকাসন্দি নাম
নেবু আদা আম্রকোলি বিবিধ সন্ধান।
ধনিয়া মহুরি তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া
নাড়ু বাঁধিয়াছে চিনির পাক করিয়া।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা
যত্ন করি গুণ্ডি ভরি পুরানো সুকুতা।
কর্পূর মরীচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস।

সান্দি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া। ইত্যাদি।

আমিষ রান্নার বেলায়

বড় বড় কৈমৎস্য ঘনঘন আঞ্জি
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি।
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি
চিতলের কোল ভাজে রসবাস মাখি।
বেত আগ বালিয়া চুঁচুরা মৎস্য দিয়া
সুকুত ব্যঞ্জন রাঁন্ধে আদা বাটিয়া। ইত্যাদি

আবার কাউঠার মাংস রাঁন্ধে তৈল ডিম্ব দিয়া
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া
কৈতরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা
ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল
ছাল খসাইয়া রাঁন্ধে বুড়া খাসীর তেল।
ছাগমাংস কলার পাতে অতি অনুপাম।
ডুম ডুম করিয়া রাঁন্ধে গাড়রের চাম। ইত্যাদি।

খাবার জিনিসের এত রকম্ ফর্দ আছে পড়তে পড়তে অনেকেরই হয় তো খিদে পেয়ে যায়।

পরার বেলায় পুরুষরা পাগড়ি, কুণ্ডল, আঙিয়া (জামা) কাপড়, জুতা পরে বেরুতেন। মেয়েরা মেঘডম্বুরী গঙ্গাজলী অগ্নিপাটের শাড়ি পরে, সিথিঁ কুণ্ডল, নথ নোলক ,বেশর, হার, বাজু পঁইছা বালা চন্দ্রহার গোট বাঁকমল পাঁয়জোর নূপুর চুটকী প্রভৃতি নানাবিধ অলংকারে নিজেদের শোভা বাড়িয়ে তুলতেন।

অন্যান্য বিষয়েরও যথেষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সবই প্রায় একরকম তবে অনেক কিছু তার ভেতর আছে যা এসময়ে লোপ পেয়ে গেছে।

লোকসাহিত্য

বাংলায় একদিকে যেমন বড়ো বড়ো কাব্য রচিত হয়েছে, তেমনি অপর দিকে ছোটো ছোটো বিষয় নিয়েও প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ছড়া খুব প্রাচীন। খেলার ছড়া, ছেলে-ভুলানো ছড়া, উপদেশের জন্য ছড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ের ছড়া আছে। এমন অনেক ছড়া আছে যার রচনার সময় ঠিক করা কঠিন। সেগুলি অতি পুরোনো।

১. খেলার ছড়া

খেলা করা প্রাণীর ধর্ম। পশু পক্ষী থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেই আনন্দের সঙ্গে খেলা করে। এই খেলার আনন্দটির সঙ্গে পদ্য যোগ করে সেটাকে আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্য বোধ হয় খেলার ছড়া তৈরি। সবাই কোনো না কোনো রকম খেলার ছড়া জানে। কয়েকটির দু-এক লাইন করে নমুনা দিচ্ছি :

"ঘুঘু সই পুত কই কী ছেলে, বেটা ছেলে।" ইত্যাদি
"ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চামের কৌটো মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর।"
"আক্কা বাক্কা তিন তলাক্কা
লোয়া লাঠি চন্নন কাঠি",
"উলুকুটু ঢুলুকুটু নলের বাঁশি
নল ভেঙেছে একাদশী।"

"তালগাছ কাটন বোসের বাটন হেন গৌরী ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী।"

এইসব ছড়াগুলির মধ্যে হয়তো কোনো অর্থের সংগতি নেই। তা না থাকলেও এর মধ্যে একটা ঝংকার আছে, যাতে মন খুব মাতিয়ে দেয়। এইজন্যেই কতকাল থেকে সমান ভাবে এগুলি আমাদের মন দখল করে আছে।

২. ছেলে-ভুলানো ছড়া

ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলিও অতি চমৎকার। ছোটো ছোটো ছেলেরা শুনে ভারি খুশি হয়।

খোকাকে ঘুম পাড়াবার জন্য মা খোকার গায়ে থাবা দিতে দিতে সুর করে ছড়া বলছেন, আর খোকা আধবোঁজা চোখে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে :

ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো। ইত্যাদি

কিংবা খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। ইত্যাদি

শুধু ঘুমানো নয় খোকাখুকুর যত কিছু কাজ সবগুলির বিষয়ে এই ছড়া আছে, এমন কি, তাদের কাল্পনিক বিয়ের ওপর পর্যন্ত। এ ছড়াগুলিও অতি প্রাচীন। কার রচিত তা কেউ জানে না।

খোকন এল বেড়িয়ে দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
হাঁটি হাঁটি পা পা দুধি ভাতি খা' খা'
জাদু হাঁটে রাঙা পা॥
খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে॥

বাপ ধন ধন ধনা পুঁথি হাতে পড়বে মানিক
দুলবে কানে সোনা ॥
খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি
সঙ্গে যাবে কে
বাড়িতে আছে কুনো-বিড়াল
কোমর বেঁধেছে ॥
খুকুমণির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে ॥
উলু উলু মাদারের ফুল বর আসছে কত দুর
বর আসছে বামুনপাড়া বড়ো বৌ গো রান্না চড়া ॥
খুকুন বালা টাকার ছালা
মটকি ভরা ঘি
খুকুমণির বিয়ে হোলো না
ছি ছি ছি ॥
খুকুমণি দুধের ফেনি কৌ গাছের মৌ
সব ছেলেদের বলব খুকুন হাঁড়ি-খাগীর বৌ ॥
দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে যখনি নিয়ে যাবে তখনি ॥
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সুজ্জি গেছে পাটে
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে ॥

এইরকম শত শত ছড়া আমাদের দেশে মেয়েদের মুখে মুখে রয়েছে। উদ্ধৃত ছড়ার অংশগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কত রকমে এগুলিতে

খোকাখুকুর কথা বলা হয়েছে। এগুলি আমাদের মা-বোনের অন্তরের কথা। তাই এগুলি চমৎকার আর এমন চিরনূতন।

৩. বিবিধ

আরো একরকম ছড়া আছে সেগুলিতে আমাদেরি ঘরোয়া কথা শিব দুর্গা বা গোপালের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মায়ের মনে বড়ো কষ্ট হয়। এতকাল ধরে যাকে বুকেপিঠে করে মানুষ করা হোলো সেই মেয়ে চিরকালের মতো অপরের হয়ে গেল। মায়ের মনের সেই মেয়ের বিয়োগ-ব্যথাই আগমনী আর বিজয়ার ছড়ারূপে ব্যক্ত।

ছেলে বা স্বামী বিদেশে গেলে মা বা স্ত্রীর মনে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টই ব্যক্ত হয়েছে যশোদার আর রাধিকার মুখ দিয়ে।

কখনো কখনো আবার সাময়িক ঘটনা নিয়েও ছড়া তৈরি হয়েছে। যেমন দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, হাতিধরা, প্রজাবিদ্রোহ অথবা কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভালো বা মন্দ কাজের সমালোচনা প্রভৃতি।

৪. ডাক ও খনার বচন

উপদেশ বা কাজের বিষয় নিয়ে যে-সব ছড়া সেগুলিকে বচন বলে। যেমন—ডাকের বচন, খনার বচন, প্রবাদবচন ইত্যাদি। ডাকের বচন আর খনার বচনে অনেক কাজের কথা আছে। এগুলিও খুব পুরোনো। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। যথা:

উপদেশ

যথা ধর্ম তথা জয়
পাপ করলে ভুগতে হয়।
লিখলে পড়লে দুধি ভাতি
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি।

লেখাপড়া করে যে
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। ইত্যাদি

ধর্মের লক্ষণ

ধর্ম করিতে যে জন জানি
পুখর দিয়া রাখিয় পানি
অশ্বত্থ রোপে বড়ো কর্ম
মণ্ডপ দেয় অশেষ ধর্ম
অন্ন বিনা নাহি দান
ইহাপর ধর্ম নাই আন ॥

রান্নার কথা

নিম পাতা কাসন্দির ঝোল
তেলের উপর দিয়া তোল্ ॥
মদ্গু্র মৎস্য দা দিয়া কুটিয়া
হিঙ্ আদা লবণ দিয়া
তেল হলদি তাহাতে দিব
বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব ॥

ভালো গৃহিণী

মিঠা রাঁধে সরুয়া কাটে
সে-গৃহিণীতে ঘর না টুটে ॥

মন্দ গৃহিণী

যে গৃহিণী আয় ব্যয় না বুঝে
বোল বলিতে উত্তর যুঝে

ভালো বলিতে রোষ করে
তাহার স্বামী কেন থাকে ঘরে ॥

এই রকম ডাকের বচনে ঘরোয়া কথা পাওয়া যায়। খনার বচন বেশির ভাগ চাষবাস সম্বন্ধে। যেমন :

শোন্ বাপু চাষার বেটা
বাঁশ ঝাড়ে দিয়ো ধানের চিটা
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে
দুই কুঁড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥
যদি বর্ষে আগনে রাজা যান মাগনে ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥
দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পুব দুয়ারী ঘরের প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী ঘরের তাপ
উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ ॥
মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে
যদি হয় শনি
খনা বলে সে-বছর
হবে শস্যহানি ॥
আঁবে ধান তেঁতুলে বান ॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা
বল্ গে চাষায় বাঁধতে আল
আজ না হয় জল হবে কাল ॥

কচু বনে ছড়াস ছাই
খনা বলে তার সংখ্যা নাই ॥
দূর সভা নিকট জল ॥

এইরকম ঢের ছড়া খনার নামে প্রচলিত। ডাক আর খনার সম্বন্ধে নানা রকম বাজে গল্প রটানো আছে। মনে হয় নানা সময়ে গ্রাম্য লোকেরা বার বার দেখেশুনে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাই এইরকম ছড়ার আকারে ডাক আর খনার নামে প্রচলিত।

অবশ্য ডাক আর খনা নামে সত্যকারের লোক হয়তো ছিলেন।

৫. প্রবাদ বচন

বিদ্বানেরা বলেন, যে-ভাষায় প্রবাদবচন নেই, সে-ভাষা অসম্পূর্ণ। প্রবাদবচনে ছোট্ট ছোট্ট কথায় বড়ো বড়ো ভাব প্রকাশ করা যায়। প্রবাদবচনের সংখ্যা বাংলায় কম নয়। তার কতকগুলি সংস্কৃত বা অন্ত ভাষার বই থেকে এসেছে, আবার কতকগুলি লোকের মুখে মুখে চলে আসছে।

গদ্য আর পদ্য, উভয় রূপেই প্রবাদবচন পাওয়া যায়।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ॥
নাচতে না জানলে উঠানের দোষ ॥
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ॥
অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়চড় করে ॥
একঢিলে দুই পাখি মারা ॥
বোঝার উপর শাকের আঁটি ॥
মাকড় মারলে ধোকড় হয় ॥
কাঙালের কথা বাসী হোলে খাটে ॥

এগুলি প্রায়ই আমরা শুনি আর বলি। মিল-করা প্রবাদবচনগুলিও চমৎকার।

অকালে না নোঁয় বাঁশ
বাঁশ করে টাঁ্যাশ টাঁ্যাশ ॥
পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী ॥
যতনের মধু পিঁপড়ে খায়
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায় ॥
নদীতীরে বাস ভাবনা বারো মাস ॥
কড়ি ফটকা চিড়ে দই কড়ি বিনে বন্ধু কই ॥
যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় দুজন ॥
যার শিল তার নোড়া তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া ॥
দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ ॥
নিজের বেলায় আঁটিসুটি পরের বেলায় চিমটি কাটি ॥
আছে গোরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল ॥

এ-সব প্রবাদবচন নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, যথাসময় লাগসই ভাব প্রকাশ করতে এগুলি অদ্বিতীয়।

৬. ব্রতকথা

কতগুলি নিয়ম পালন করে বিশেষ বিশেষ সময়ে, কোনো দেবতার উদ্দেশে, নিজের সুখসৌভাগ্য কামনা করে, পূজা-অনুষ্ঠান করা আমাদের দেশে অনেককাল থেকে চলে আসছে। এগুলির প্রায় সবই মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য অনিশ্চিত। বড়ো হয়ে তাদের পরের ঘরে যেতেই হয়। কেউ বা মনোমতো ভালো-ঘরে প'ড়ে

সারাজীবন সুখে কাটায়, কেউ বা মন্দ ঘরে প'ড়ে সারাজীবন দুঃখ পায়। তার ওপর সেকালে অনেককে সতিন নিয়েও ঘর করতে হোত।

অদৃষ্ট মন্দ হোলেই দুঃখ হয়। এই দুঃখভোগ যাতে না করতে হয়, সেইরকম কামনা ক'রে মন্দ অদৃষ্টকে ভালো করবার জন্যেই বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে এতরকম ব্রত করার রীতি। আইবুড়ো-বেলা থেকেই মেয়েরা এইসব ব্রত করে। এই ব্রতগুলির ছড়া (বা বাংলামন্ত্র) আছে। সেগুলিতে তখনকার কালের মনোভাব বেশ বোঝা যায়। যমপুকুর, পুন্যিপুকুর, তুষতুষুলি, নাটাই, সেঁজুতি প্রভৃতি নানা রকম ব্রত প্রচলিত। একটা ব্রতের ছড়ার নমুনা দেখা যাক। এটা তুষতুষুলি ব্রতের ছড়া।

তুষতুষুলি তুমি কে, তোমায় পূজা করি যে
ধনে ধানে বাড়ন্ত সুখে থাকি আদি অন্ত,
তোষলো লো তুষকুন্তি ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি,
গাইয়ের গোবর সরষের ফুল, আসনপিঁড়ি এলোচুল,
গাইএ গোবরে সরষের ফুল, ওই করে পূজি বাপ মার কুল।
কোদালকাটা ধান পাব, গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব, সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব, হাঁড়িমাপা সিঁদুর পাব,
ঘর করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে (গঙ্গাসাগর তীর্থে)।
জন্মাব উত্তম কুলে
তোমার কাছে মাগি এই বর,
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

ব্রতের সব ছড়াগুলিতেই সুখসৌভাগ্য, ঐশ্বর্য আর শত্রুনিপাতের কামনা আছে। বড়োদের ব্রতকথার মধ্যে রামেশ্বর পণ্ডিতের সত্যনারায়ণের কথা অনেকেই জানেন, কিংবা শুনেছেন।

ছেলেদের এ-রকম অনুষ্ঠান বড়ো পাওয়া যায় না। তারা লেখাপড়া করে, কাজকর্ম করে। কালি তৈরি করার একটা ছড়া আর সরস্বতীর কাছে একটা প্রার্থনার ছড়া সকলেরই জানা :

কালি ঘটম্ কালি ঘটম্
সরস্বতীর পায়,
তোর দোয়াতের ভালো কালি
মোর দোয়াতে আয়।

গলায় গজমোতি মুক্তার হার
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।

গীতিকাব্য

গীতিকাব্য বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধর্ম, লোকাচার, প্রেম প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বন করে গীতিগুলি রচিত।

সবচেয়ে যা প্রাচীনগান পাওয়া যায়, তা বৌদ্ধসাধকদের। তাতে তাঁরা নিজেদের সাধনার কথা বলেছেন, এই গানগুলি সব জায়গায় বোঝা যায় না। হাজার বছর আগেকার লেখা কি না। ভাষা সেইজন্যে অনেকটা দুর্বোধ।

মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহুল পাত ফলাহ যাহা
বর গুরু বঅনে কুঠারেঁ ছিজঅ
কাহ্ন ভনই তরু পুন ন উইজঅ

এ সেই পুরানো বাংলা। এতে ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই :

মন হচ্ছে গাছের মতো। পাঁচ ইন্দ্রিয়— চোখ কান নাক জিব আর ত্বক— সেই গাছের পাঁচটা শাখা। আশা তার পাতা আর ফল। মানুষের আশাই মানুষকে অসুখী করে ব'লে ধর্ম-আচরণে আশার মূল মনকে শান্ত করতে হয়। গুরুর বচনরূপ কুঠার দিয়ে মনতরুকে ছেদন করো, তাহলে সে আর জন্মাতে পারবে না। এই গানটি কানু আচার্য রচনা করেছেন তাই বলা হয়েছে "কাহ্ন ভনই"— অর্থাৎ কানু এই কথা বলছেন। গানের শেষে রচয়িতার নাম দেওয়াকে "ভণিতা" বলে। গানে ভণিতাদেওয়ার রীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন নামে বইখানি খুব প্রাচীন। এই চণ্ডীদাস বড়ুচণ্ডীদাস বলে খ্যাত। আরো একজন চণ্ডীদাস ছিলেন তিনি দীনচণ্ডীদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের একজনের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ছাদনা গ্রামে আর একজনের বাড়ি বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে।

চণ্ডীদাস দুজন না একজন এই নিয়ে দুদল পণ্ডিতের দুই মত। তার মীমাংসা এখনো পর্যন্ত কিছু ঠিক হয়নি। বাঁকুড়ার চণ্ডীদাসই শেষ বয়সে বীরভূমে এসে বাস করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

কংসের সভায় নারদ এসেছেন, বড়ুচণ্ডীদাস তার বর্ণনা করেছেন :

আয়িলা দেবের সুমতি গুণী
কংসের আগক নারদ মুনী।
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ
বামন শরীর মাকড় বেশ।
নাচএ নারদ ভেকের গতী
বিকৃত বদন উমত মতী।
খণে খণে হাসে বিণি কারণে
খণে হএ খোঁড় খোণেকেঁ কাণে।

নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে
খণেকেঁ ভূমিতে রহে চিতরে।
উঠিআঁ সব বোলে আনচান
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।

কবিতার বানানগুলো লক্ষণীয়। এখনকার বানানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। এবার দীনচণ্ডীদাসের একটা পদ দেখা যাক।

শ্রীকৃষ্ণ ছেলেমানুষ। মা যশোদা তাঁকে গোরু চরাতে পাঠিয়েছেন। তাই দেখে একজন দুঃখ করে বলেছেন :

সই কী আর বলিব মায়,
তিল দয়া নাহি তাহার শরীরে
একথা কহিব কায়।
মায়ের পরান এমনি ধরন
তার দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম চরণ
বনে নহে পাঠাইতে।
কেমনে ধাইব ধেনু ফিরাইব
এ হেন নবীন তনু,
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন ভানু।

বিপিনে বেকত ফণী শত শত
কুশের অঙ্কুশ তায়,
সে রাঙা চরণে ছেদিয়া ভেদিব
মোর মনে হেন ভায়।
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়া লয়।

চণ্ডীদাস কয় না ভাবিহ ভয়
সে হরি জগতপতি
তারে কোনো জন করিব তাড়ন
এমন না দেখি কতি ॥[১]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন নবদ্বীপে—৮৯২ বঙ্গাব্দে, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। এঁর আসল নাম বিশ্বম্ভর। অল্প বয়সেই ইনি অসামান্ত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন কিন্তু পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে দিলেন ধর্মের দিকে মন। সে সময়ে ধর্ম ও সমাজের বড়ো দুরবস্থা ছিল। বিশেষত হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণিদের মধ্যে দুর্দশার অন্ত ছিল না। বিশ্বম্ভর তাঁর সমস্ত প্রতিভা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন এই সব নিম্ন-শ্রেণি আর-আর উচ্চশ্রেণির মধ্যে ধর্মের ভেতর দিয়ে একতা আনতে।

চব্বিশবছর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। গুরু

১ চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে অনেক পদ রচনা করেছেন। সেগুলি বাঙালিরা গেয়ে গেয়ে এমন ভাবে নিজস্ব করে নিয়েছেন, যে এখন সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অংগ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিচ তা মৈথিলি ভাষায় রচিত।

কেশবভারতী এঁর বিশ্বম্ভর নাম বদলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দেন। তারপর তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই ধর্মের আশ্রয়ে এসে বাংলা দেশে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। ইনি সহায়ও পেলেন অনেককে। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য আর একচক্রার নিত্যানন্দ দুইজন চৈতন্যদেবের প্রধান সহায় ও সহকর্মী। বাংলার নবাব হোসেনশার মন্ত্রী ও মুন্সি সনাতন আর রূপ, সপ্তগ্রামের জমিদারের ছেলে রঘুনাথ, শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি দেশের বড়ো বড়ো লোক চৈতন্যদেবের অনুবর্তী হন।

সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব পুরীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র এঁকে দেবতার মতো মানতেন। চৈতন্যদেবের অনুবর্তী ভক্তদের দ্বারা অসংখ্য বই সংস্কৃতে আর বাংলায় লেখা হয়েছে।

ভালোবাসার ভেতর দিয়েই ভগবান সহজে ভক্তের কাছে ধরা দেন। তা তাঁকে প্রভু, পিতা, সখা বা পতি যে ভাবেই ভালোবাসা যাক না কেন। যাঁরা ভগবানকে ভালোবাসেন তাঁরা সবাই সমান, এই ছিল চৈতন্যদেবের বক্তব্য। আটচল্লিশ বছর বয়েসে ইনি ধরাধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর জন্মের আগে বাংলাসাহিত্যের যে-চেহারা ছিল, জন্মের পরে, তাঁর অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা সে-চেহারা একেবারে বদলে গেল। চণ্ডীকাব্য প্রভৃতিতে ভক্তে আর দেবতায় ছিল দূরত্ব। এঁদের কাব্যে ভক্তে আর দেবতায় ঘটল একত্ব। মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলা-দেশকে প্লাবিত করে দিল—নতুন ভাবে। সেই ভাবকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠল বৈষ্ণব সাহিত্য। এই সাহিত্যে মানুষের ভয় ও আত্মাবমাননার বিকৃতি নেই, আছে প্রেম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরব।

সেইসময় যে-সব গান রচনা হোলো তার তুলনা আর মেলে না। যে দীনচণ্ডীদাসের কথা আগে বলেছি তিনি নাকি মহাপ্রভুর পরবর্তী লোক। তাছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, নরহরিদাস,

বাসুঘোষ, নাসিরমামুদ, সালবেগ, সৈয়দমর্তুজা, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি বহুকবি গান রচনা করেন। এঁদের এই গানগুলিকে পদাবলী বলা হয়।

এইসব বৈষ্ণবকবিদের পদ এখনো সর্বত্র কীর্তন করা হয়। দল বেঁধে খোলকরতাল নিয়ে গান করাকে কীর্তন বলে।

পদগুলিতে কৃষ্ণের আর চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কতকগুলিতে স্তবস্তুতি, কতকগুলিতে ভগবানের নামমাহাত্ম্যও বলা হয়েছে। এই বৈষ্ণবকবিদের ভাব নিয়ে পরবর্তী যুগে অসংখ্য কবির কাব্য রচিত হয়েছে, আর এখনো হচ্ছে।

হাজার চারেকের ওপর বৈষ্ণবপদ ছাপা পাওয়া যায়—সেগুলি বিচিত্র রসে ভরা। একটিমাত্র এখানে উদাহরণ স্বরূপে দেওয়া গেল। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আকুলতা জানাচ্ছেন—

হেদে হে নাগর বর, শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়
চরণ নখর মণি যেন চাঁদের গাঁথনি
ভালো শোভে আমার গলায়।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পানে চেয়ে।
চাই নবীন মেঘের পানে তুয়া বঁধু পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
মণি নও মাণিক্য নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশ

নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়
কী মোর মনের সাধ বামন হৈয়া চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পুরাবে আমায়।
নরোত্তম দাসে কয় তোমার উচিত হয়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া
যেদিন তোমার ভাবে আমার এ দেহ যাবে
সেই দিন দিয়ো পদছায়া ॥

বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধে পদ রচনা করেছেন তেমনি কিছু পরে শাক্ত কবিরা শক্তি অর্থাৎ কালীর সম্বন্ধে নানা ভাবের পদ রচনা করেছেন। এঁরা জগন্মাতার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে বিভোর হয়েছিলেন। শাক্ত পদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনের আর কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের গানগুলি প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মুখে এই পদগুলি দেশময় ছড়িয়ে আছে। রামপ্রসাদের একটি গান—

আমি কি দুখেরে ডরাই।
দুখে দুখে জন্ম গেল আর কতো দুখ দেও দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনোখানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের পোকা বিষে থাকি মা বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, নামাও বোঝা ক্ষণেক জিরাই,
দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই ॥

এরপর আসে বাউল সম্প্রদায়ের কথা। এঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই আছেন। এঁদের গানে ভাষায় আর সুরে এমন একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে যে শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এঁদের গানের ভাব সহজে ধরা যায় না। যেমন—

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইরে কোনো দুখ।
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশি আমি তোমার ফুঁক
ভালো মন্দ রন্ধ্রে বাজি সুখ আর দুখ
সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইৎ রাতে
ফাগুন বাজি সাঁওন বাজি তোমার মনের সাথে
একেবারেই ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা আর কী আমি চাই॥

প্রেমসম্বন্ধে যাঁরা গান লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে হরুঠাকুর ও নিধুবাবু খ্যাতি লাভ করেন।

এই ধরনের গান ছাড়া নৌকাচালানোর সময় মাঝিদের সারিগান, সঙের গান, ময়ূরপংখির গান, গাজনের গান, গাজির গান, পীরের গান প্রভৃতি নানা রকম গান আছে। এককথায় বলতে গেলে আমাদের বাংলাসাহিত্য ফুলেভরা সাজির মতো নানা রকমের, নানা ভাবের গীতিকাব্যে ভরা।

অনুবাদ-সাহিত্য

একদল লোক ছিলেন যাঁরা সংস্কৃত বা অন্য ভাষা থেকে নানা বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদের জন্য দেশের রাজারা নবাবেরা খুব উৎসাহ দিতেন, অর্থও দিতেন। রামায়ণ মহাভারতের যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসের নাম বঙ্গবিশ্রুত।

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কাশীখণ্ড, হরিবংশ প্রভৃতি অনেক বইএর বাংলায় অনুবাদ করা হয়। চৈতন্যপূর্ববর্তী মালাধর বসুর কৃষ্ণবিজয় নামে কাব্যখানি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বন করে লেখা। এখানি ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট। যদুনন্দন ঠাকুরও সেকালের একজন নামজাদা অনুবাদক—ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থের সুললিত পদ্যে অনুবাদ করে গেছেন। অনুবাদগুলি প্রায়ই পদ্যে করা। সভায় যেমন মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গাওয়া হয়, তেমনি এইসব অনুবাদগুলিও সভায় সুর করে প'ড়ে মানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মূল বইগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা ব'লে তাতে কী আছে তা সকলে জানতে পেত না। এই অনুবাদের জন্য শত শত নিরক্ষর লোক শাস্ত্রের কথা জানতে পেরেছে।

চরিত কাব্য

আবার একদল লোক জীবনচরিত লিখেছেন। এই জীবনচরিতের মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভু আর তাঁর সঙ্গীদের জীবনের কথাই বেশি।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী নিয়ে—

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, কবিরাজ কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ; আর

অদ্বৈতপ্রভুর চরিত্র নিয়ে—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল লেখা হয়।

এইরকম কর্ণানন্দে ও নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী, রসিকমঙ্গলে রসিকানন্দ ঠাকুরের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এইরকম মহাপুরুষদের চরিত্র অবলম্বন করে ভক্তমাল প্রভৃতি অনেকগুলি ছোটো বড়ো বই লেখা হয়।

নাটক ও যাত্রাভিনয়

সবসময় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা সকলের পছন্দ নয়। তাই যাত্রাউৎসব উপলক্ষ্যে ধুমধাম করা অনেক দিন থেকে আমাদের মধ্যে চলে আসছে। পূর্বকথিত মঙ্গলগান, কীর্তন প্রভৃতি যেগুলি জনসাধারণে প্রচলিত, সেগুলিতে একটি গাম্ভীর্য ছিল। কিন্তু নিছক আমোদপ্রমোদ আর মজা করবার জন্যও তো চাই কিছু। মনে হয় সেজন্যে নাটক, কবি, পাঁচালি, তরজা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। অভিনয় (নাটক) করা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কাজেই বাংলাদেশেও তা বাদ যায়নি। তবে এখন যে-আকারে নাটক-অভিনয় হয়, সেকালে সে-আকারে হোত না।

নেপালের রাজার পুস্তকালয় থেকে খানকয়েক বাংলানাটক পাওয়া গিয়েছে। সেইসব নাটকে গদ্যে কথাবার্তা নেই, কেবল ছোট্ট ছোট্ট পদ্যে বা গানে কথাবার্তা চলেছে দেখতে পাই। পরবর্তীকালে বাংলার যাত্রাওয়ালারা বড়ো রকমে দল বেঁধে নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন।

পুরানো নাটকে রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের ঘটনাই বেশি থাকত। অভিনয়ের সময় কোনো পাত্রবিশেষকে সঙ্ সাজিয়ে দর্শকদের খুব হাসানো হোত।

বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোকাধোপা, সুর্যিহাড়ি, নীলকণ্ঠ মুখুজ্যে, মতি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন যাত্রার জন্য বিখ্যাত হন, বিদ্যাসুন্দর অভিনয় ক'রে গোপাল উড়ের দল প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যাত্রাতে অনেক লোক লাগে, তোড়জোড় খুব বেশি করতে হয়। কিন্তু পাঁচালিতে অত লোক লাগে না ; একজন ছড়া কাটে, আর মাঝে মাঝে গান করে, গানের সময় দু-চারজন দোহারকি দেয় সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজে। এই পাঁচালিতে লোকে খুব আমোদ পেত। কেননা, পাঁচালির রচনা শ্রুতিমধুর আর কৌতুকজনক। একদিকে যাত্রা যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল অপরদিকে পাঁচালিও তেমনি জনপ্রিয় হয়। যাত্রা ও পাঁচালির বিষয়বস্তু একই, হয় পৌরাণিক নয় লৌকিক। পাঁচালিতে বলিরাজার উপাখ্যান চলছে। নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে—

বলে নারদের বীনে
ও হরি আরাধন বিনে দিন যায় বৃথে।
চিন্ত রে দুরন্তভাবের ভয়ান্ত হইবে যাতে।
স্থির করো নিজ চিত্ত হরিপদে রাখো নেত্র
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র অত্র সন্ধ নাস্তি ইথে ॥

মনে মনে মন্ত্রণ করে মহামুনি ধীরে ধীরে
কৈলাস শিখর পরে যাচ্ছেন
বাজে বীণা সুমধুর তাহে মিলাইয়া সুর
শ্রীহরি-গুণানুবাদ গাচ্ছেন।
পুলকিত অন্তরে প্রবেশি কৈলাস পুরে
দেবঋষি চারিদিকে চাচ্ছেন,
দেখেন মুনি কোনো স্থানে ভূত প্রেত দানাগণে
শিব নামে মত্ত হয়ে নাচ্ছেন।

ময়ুর ময়ূরী কত নৃত্য করে অবিরত
মারুত মন্দ মন্দ বহিছে
ডালে বসি পিকবর হানিছে পঞ্চম স্বর
ফুলে ফুলে বৃক্ষ শোভা হয়েছে।

সে শোভা কেমন—

ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র নদের শোভা গোরা
নিশির শোভা শশী যেমন শশীর শোভা তারা।
বৈষ্ণবের কোপ্নী শোভা মোল্লার শোভা দাড়ি
নগরের শোভা যেমন অট্টালিকা বাড়ি।
সমুদ্রের ঢেউ শোভা ঢাকের শোভা টোয়ে
তেমনি শোভা দেখেন মুনি কৈলাসে আসিয়ে।

পাঁচালিরচনার এই হোলো নমুনা।

পাঁচালিকারদের মধ্যে দাশরথি রায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সেকালে এঁর যশ আর আদর ছিল অফুরন্ত। এখনকার কালে পাঁচালি হয়তো সকলের পছন্দ হবে না। ব্রজ রায়, রসিক রায় প্রভৃতি অনেকেই পাঁচালি রচনা করে খ্যাতি লাভ করে গেছেন। আজকাল আমাদের দেশ থেকে পাঁচালি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে।

সেকালে আর-এক রকম গানের প্রচলন ছিল, তাকে বলত কবি-গান। কবিগানে দুটো দল থাকে। একদল অন্যদলকে পদ্যে প্রশ্ন করে, অপর দলও পদ্যে উত্তর দেয়। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে না পারলে ঠকে যেতে হয়। এই উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় অশ্রাব্য গালাগালি পর্যন্ত চলতে থাকে। সেজন্য কেউ কেউ কবিগান পছন্দ করে না। কবিগান আজও ক্ষীণ প্রাণ নিয়ে টিঁকে আছে কোনো রকমে।

এই কবিগানেরই রকমফের তরজা, ঝুমুর, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি। সবগুলিতেই উত্তর প্রত্যুত্তর থাকে।

একজন খাস্ পর্টুগীজ বাংলাদেশে এসে এমনি বাংলা শিখেছিলেন যে, তিনি একটা কবির দলই করে ফেললেন। তাঁর নাম এণ্টনি সাহেব। ভোলাময়রা বলে একজন কবি অনেক ক্ষেত্রে এণ্টনি সাহেবের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে উক্তি প্রত্যুক্তি করতেন। যেমন— আসরে উঠে এণ্টনি সাহেব গান ধরলেন :

ভজন পূজন জানিনে মা জেতেতে ফিরিঙ্গি,
যদি দয়া করে তারো মোরে এ ভবে মাতঙ্গী,

তখন ভোলাময়রা মাতঙ্গী অর্থাৎ দুর্গার জবানিতে উত্তর দিলেন :

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী আমি পারবো নাকো তরাতে
তোরে পারবো নাকো তরাতে।
শোন্‌রে ভ্রষ্ট বলছি স্পষ্ট তুইরে নষ্ট মহাদুষ্ট
তোর কি কালী কৃষ্ট ইষ্ট ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে।

এণ্টনি আবার প্রত্যুত্তর দিলেন :

সত্য বটে আমি হচ্ছি জাতিতে ফিরিঙ্গি,
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে সব একাঙ্গী। ইত্যাদি।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে একজন পর্টুগালের লোক বাঙালির আসরে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। এটা কম শক্তির পরিচয় নয়।

এই কবিওয়ালাদের মধ্যে গোঁজলাগুঁই, হারুঠাকুর, ভবানীবেনে, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কয়জন খুব নামজাদা হয়ে ওঠেন। অনেকের মত ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম থেকেই কবিগানের চলন হয় আর গোঁজলা গুঁই এর প্রবর্তক। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে অকাবাই যজ্ঞেশ্বরী মাধবী মোহিনী প্রভৃতি দু-চারজন মেয়ে কবিও ছিলেন।

ধামালি বলে আর-এক জাতীয় গান আমাদের দেশে ছিল। ধামালি মানে রঙ্গরস, হাসিঠাট্টা। এই ধামালি গান সব জায়গায় সব সময় হোতে পারত না।

গদ্য

এতক্ষণ পর্যন্ত যে-সব গান-গল্পের কথা বলা গেল সেগুলি সবই পদ্যে লেখা। সেকালে গদ্যলেখার রীতি প্রায় ছিল না। অবশ্য চিঠিপত্রে আর দলিল বা দানপত্রে গদ্য লেখা চলত। কাজেই গদ্য কী রকম ভাবে পড়তে হয় তাও সাধারণের জানা ছিল না। পরবর্তীযুগে রাজা রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখে জনসাধারণের মধ্যে চালান, তখন গদ্য পড়বারও একটা নিয়ম করে সকলকে জানাতে হয়েছিল। এতেই সেকালের গদ্যের অবস্থা বোঝা যায়।

পুরোনো গদ্যের মধ্যে বইআকারে যা পাওয়া যায় তা সহজিয়া বৈষ্ণবদের বই। ছোটো ছোটো বাক্য গদ্য দিয়ে রচিত। যেমন :

সম্প্রদায় কয়। সম্প্রদায় চারি। রামানন্দী শ্যামানন্দী নিমানন্দী মাধবাচার্য একুন চারি সম্প্রদায়। তোমরা কোন্ সম্প্রদায়। নিমানন্দী। ধর্ম কোন্ রাগ। বৈধিক। যজক কোথাকার। ব্রজবাসী ইত্যাদি।

ছোটোবাক্যে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রচিত বলে এগুলি বেশ সহজ। চিঠিপত্র ও দলিল-দানপত্রের গদ্য তত ভালো ছিল না। কমা সেমিকোলন প্রভৃতি কোনো চিহ্ন তো ছিলই না, ছিল একমাত্র দাঁড়ি। তাতে বাক্যগুলি লম্বা লম্বা আর দুর্বোধ হয়ে দাঁড়াত। একখানা সেকেলে চিঠির অংশ :

"আরু তোমার মানুসের মুখ হস্তে সমাচার শুনিয়া প্রত্যুত্তর কহিয়াছি শুনিবা। আপনে লিখিছিলা দ্রব্যের কারণ লিখিবার তাতো সকল

দ্রব্যাই প্রীতির অধিন এখন যে আমাতে উপস্থিত হয় তানে লিখিয়া পাঠাব।" ইত্যাদি।

সত্যকথা বলতে কী, বাংলা-গদ্যরচনার সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজআমলে, তার অন্যতম স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়।

আধুনিক যুগ

গদ্য-রচনা

বাংলায় ইংরেজরাজত্বের আরম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে-যুগ, তাকে আধুনিক যুগ ব'লে ধরা গেল। এই যুগই বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতির কাল। ভারতচন্দ্র রায় আর রামপ্রসাদ সেন এই যুগের আদিতে বর্তমান।

পোর্টুগীজ ও ইংরেজ মিশনারিরা এসে তাঁদের ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হোলো, তার ফলে এদেশে খ্রীস্টানধর্মের প্রসার গেল কমে। মিশনারিদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে প্রতিবাদগুলি সব গদ্যেই লেখা হোত। রাজা রামমোহন ছিলেন এর অগ্রণী। তিনি বেদ উপনিষদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র থেকে যুক্তি সংগ্রহ করে লিখতে লাগলেন বাংলায়। এই সময় দু-একখানা সংবাদপত্রও বেরুতে লাগল। তা অবশ্য গদ্যেই লিখতে হোত।

এমনি করে কিছুকালের মধ্যে বেশ খানিকটে গদ্য, বাংলাতে জমে উঠল। রামমোহনের আগেকার গদ্য কিম্ভূতকিমাকার ছিল। এই সময় বাংলাদেশে যে-সব ইংরেজরা আসেন, তাঁরাও বাংলা শিখে বইপত্র লিখতে আরম্ভ করেন। কতগুলি গদ্যের নমুনা দেওয়া গেল।

কেরি সাহেবের লেখা গদ্য :

"আঃ মহাশয় এই যে খবর করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গে দশ বার জনকে বিদায় এক এক জনকে দশ বার টাকা করিয়া দিয়াছে। আর উহাকে কতই সয়।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্য :

"দূরবর্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণ-বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকট বশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসনভূষণকদলীমূলক

ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। হট্টনিকটপ্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারীপুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়।"[১]

মার্সম্যান সাহেবের গদ্য :

"ইহাতে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ঐ ফৌজদারের পিতা এক তলোয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীর উপরেও ঐ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন"

তখনকার সংবাদপত্রগুলির ভাষাও এইরকম ছিল। এই গদ্য পড়ার সময় অর্থের গোলমাল হোতে পারে, সেজন্য রাজা রামমোহন গদ্যপড়ার যে নিয়ম করেছিলেন তার খানিকটা এই— "যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎপর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"

এতেই বুঝতে পারা যায়, এই নতুনপ্রচলিত গদ্যকে নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গদ্যকে বর্তমান সাহিত্যিক গদ্যের অন্যতম আদিরূপ বলে গণ্য করা যায়। তার একটা উদাহরণ এই :

"আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়িতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বেগে বায়ু উঠিয়াছে। পদ্মা তোলপাড় হইতেছে। মাঝিরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল।"

এ যেন ঠিক এখনকার লেখার মতো। এঁর সমস্ত বই এইরকম

১ মৃত্যুঞ্জয় চলিত ভাষায় সরল গদ্যও লিখে গেছেন।

ভাষায় লেখা। পরে কালীসিংহ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের গদ্যঅনুবাদ করান। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন রামায়ণের অনুবাদ করেন। এই দুখানি বইয়ের ভাষাও বেশ সুন্দর।

সাহেব মিশনারিরা বাইবেলের অনুবাদ, বাংলাব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতির গোড়াপত্তন করেন। কাজেই বর্তমান বাংলার গোড়ার দিকে সাহেবদের দান ও প্রচেষ্টা খুব ছিল। শ্রীরামপুর এঁদের কেন্দ্রস্থান। সেখান থেকেই প্রথম এদেশে বাংলাবই ছাপা হয় (তার আগে অবশ্য রোমান অক্ষরে বাংলা বই প্রথম ছাপা হয় লিসবন থেকে। পর্টুগীজ পাদরীরা তা ছাপেন।) এই প্রচেষ্টার জন্য কেরি, ওয়ার্ড, ম্যার্সম্যান প্রভৃতি সাহেবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাংলাগদ্য-রচনার রীতি সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্রকে বাংলাগদ্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রবর্তক ব'লে গণ্য করা হয়।

এর পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান বাংলায় যুগান্তর আনলেন। তাঁর বঙ্গদর্শন-নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে বাংলাগদ্যের চেহারা দিলেন বদলে। রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা উৎকৃষ্ট ধরনের গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন।

আধুনিক কালের বাংলাসাহিত্যে গদ্যসৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। এখন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলার গদ্য-সাহিত্য হয়ে রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পদ্য সাহিত্য

প্রায় সবভাষার সাহিত্যে গোড়ার দিকে দেখি পদ্য। কারণ লেখকদের পদ্যের দিকে ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী ছাড়া জনসাধারণকে অবলম্বন করেও সাহিত্যরচনা চলেছিল। এ-রকম অনেকগুলি কাহিনী ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার

লোকেদের মুখ থেকে শুনে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি লোক-সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হোলেও এর এক-একটি পূর্ণাঙ্গ বলে এখানেই তার উল্লেখ করা গেল। এই সব গল্প ছড়ার মতো, এগুলি এখন 'গীতিকা' নামে পরিচিত। গ্রাম্য কবির লেখা বলে এর ভাষা তেমন মার্জিত নয়, কিন্তু ভাব আর বর্ণনা অকৃত্রিম হওয়ায় এগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। গীতিকাগুলি থেকে এবার দু-একটা গল্প শোনানো যাক।

মহুয়া

বেদেদের সর্দার হোমরার চুরি করে আনা মেয়ের নাম মহুয়া। মেয়েটি অতি সুন্দরী। হোমরার দল দেশবিদেশে নানা রকম তামাশা দেখিয়ে বেড়ায়। মহুয়া বাঁশের ওপর, দড়ির ওপর, নেচে খাসা কসরত দেখাত। বামুনডাঙার রাজপুত্র নদের চাঁদ খেলার চেয়ে ভুললেন মহুয়ার রূপে। রাজ্য ত্যাগ করে রাজপুত্র বেদেদের পেছনে পেছন ঘুরে, শেষে মহুয়াকে নিয়ে পালালেন। নানা বিপদ আপদ সহ্য করে তাঁরা নির্জনে ঘরসংসার পেতে সুখে বাস করতে লাগলেন।

হোমরার ইচ্ছে ছিল তার দলের সুজন বেদের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ে হয়। অকস্মাৎ মহুয়ার পালানোতে সে চ'টে গিয়ে খোঁজ করতে করতে এসে এদের ধরল। তখন হোমরা একখানা বিষ-মাখানো ছুরি মহুয়ার হাতে দিয়ে হুকুম করল নদের চাঁদকে মেরে ফেলতে কিন্তু মহুয়া ঐ ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিল। বেদের দল খেপে উঠে নদের চাঁদকে টুকরো টুকরো করে ফেলল কেটে।

নিজাম ডাকাত

ডাকাত নিজাম এ-পর্যন্ত মানুষ খুন করেছে বিস্তর। ফকির শেখ ফরিদের উপদেশে সে হয়ে পড়ল সাধু। ডাকাতি ছেড়ে একমনে সাধনা করে। ফকির তাঁর লাঠি নিজামকে দিয়ে বললেন, এই লাঠিটা মাটিতে

পুঁতে দিয়ো, যেদিন দেখবে এতে কচিপাতা গজিয়েছে সেদিন জানবে তোমার সাধনার সিদ্ধি হয়েছে। কতদিন চলে গেল, কই সেই লাঠিতে তো কচিপাতা ধরল না।

একদিন এক দুর্বৃত্তকে নারীর অসম্মান করতে দেখে ক্রোধান্ধ নিজাম তাকে গিয়ে মেরে ফেলল। নিজের কাজে ক্ষুণ্ণ মনে এসে দেখে সেই নীরস লাঠিগাছি কচিপাতায় ভরে উঠেছে।

চন্দ্রাবতী

২৮ পৃষ্ঠায় মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর মেয়ে চন্দ্রাবতী। তাঁর জীবন বড়ো দুঃখের। ফুল্লেশ্বরী নদীর ধারে পাকুদিয়া গ্রামে এঁদের বাস। এই গ্রামের একটি ছেলের নাম জয়চন্দ্র। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো। শিশুকাল থেকে জয়চন্দ্র আর চন্দ্রাবতী এক সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছেন খেলাধুলা করতে করতে। বড়ো হোলে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল, শেষে বিয়েরও কথাবার্তা স্থির। বিয়ের দিন জয়চন্দ্র এলেন না, খবর এল তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে একটি মুসলমানের সুশ্রী মেয়েকে বিয়ে করেছেন। চন্দ্রাবতীর মনে বড়ো লাগল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর বিয়ে করবেন না। পূজাঅর্চা আর পিতার সেবা করে, পুঁথি লিখে, দিন কাটাবেন।

কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র নিজের কাজে অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। চন্দ্রাবতী তখন শিবমন্দিরে তন্ময় হয়ে ধ্যানে বসেছেন। জয়চন্দ্রের ডাক কানে পৌছল না। মন্দিরের দরজায় জয়চন্দ্র লিখে রেখে গেলেন— আমায় ক্ষমা কোরো। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেই লেখা দেখে চন্দ্রাবতীর চোখ ফেটে এল জল। ধীরে ধীরে তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

চন্দ্রাবতী গিয়েছেন ফুল্লেশ্বরীতে জল আনতে, কাঁখে কলসী। দেখতে

পেলেন জয়চন্দ্রের মৃতদেহ ভাসছে জলের ওপর। শোকে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

এখানে পূর্ববঙ্গের ছড়া থেকে একটু তুলে দিচ্ছি। কাঞ্চনমালা স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বিদেশে যাবার ছল করে তাঁর স্বামী এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে তার কাছেই থাকলেন। স্বামীর আশায় ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে অনেক দিন কেটে গেল কাঞ্চনমালার। শেষে সমস্ত খবর জানতে পেরে নিজে গিয়ে স্বচক্ষে স্বামীকে আর রাজকন্যাকে দেখে এলেন। তাঁর মন যেন শূন্য হয়ে গেল, তিনি গভীর রাতে নদীর ধারে এসে আপন মনে বলতে লাগলেন—

মনের দুঃক্ষু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা।
সুখেতে থাকো গো বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে করো গিরবাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম।
এই না ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা।
মনে না রাখো রে বন্ধু সেই দিনের কথা
আর না রাখিয়ো মনে সেই মালা গাঁথা।
রাতের নিশি আনিগুনি তোমার বাঁশির গানে
অভাগিনীর কথা বন্ধুরে না রাখিয়ো মনে।
কানে কানে কইবে বাতাস কানাকানি কথা
তোমার কাছে কহিবাম যত মনের বেথা।
রাত্রিকালের সাক্ষী তুমি দিবাকালের সাক্ষী
কলংকিনীর কথা জানো দেশের পশু পংখী।

দেশের লোক নাই সে জানে আমার মরণকথা
কিজানি সে শুনিলে বন্ধু মনে পাবে বেথা।
কোন্‌দেশ হইতে আসিছে রে ঢেউ যাইবা কোথাকারে,
আমারে ভাসায়ে নেও দুস্তর সাগরে ॥

তার পর কাঞ্চনমালা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এইরকম লোকালয়ের চলিত-ঘটনায় ভরা এই গীতিকাগুলি যেমন স্পষ্ট, তেমনি মর্মস্পর্শী। রূপকথার প্রভাব অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা, কতকগুলিতে আছে বটে। ছোটোবেলা থেকে দাদু-দিদার নামে প্রচলিত অসংখ্য গল্প যে ভাবে মন দখল করে থাকে তাতে ফলাও করে কিছু লিখতে গেলেই তার প্রভাব এসে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ঘটেছে তাই।

গীতিকা আর রূপকথা নানাভাবে সংগ্রহ করে এখন ছাপানো হচ্ছে। বিভিন্ন কালের রচনা বলে এগুলির কোনোটা প্রাচীন, কোনোটা আধুনিক।

এদিকে দেখি বর্তমান যুগের প্রথম ভাগে ভারতচন্দ্রের লেখা একটু স্বতন্ত্র ধরনের হোলেও সংস্কৃত ভাষার ও ভাবের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাতে একটা নতুন ধারা আনলেন। তাঁর কবিতা সরস আর নতুন ভঙ্গির বলে লোকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর সময়কার কবিরা তাঁকে অনুসরণ করে লেখবার চেষ্টা করতেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছোটো ছোটো বিষয়ের ওপর কবিতা লিখে গেছেন। সংবাদ প্রভাকর নামে একখানি সাময়িক পত্রও চালিয়েছেন। এঁর মজার মজার কবিতা আছে, যেমন :

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার,
হোলো পুন্নিমেতে আমাবস্যা, তেরো পহর অন্ধকার।

আবার ইংরেজিশিক্ষিত তখনকার নব্যদের ঠাট্টা করে লিখেছেন :

পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট, দাঁতে কাটে বিসকুট,
গো টু হেল্ ড্যাম হুট্, মা বাপেরে বলেছে।
এর চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখো আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে। ইত্যাদি।

এই সময়ে রূপচাঁদপক্ষী নামে একজন কবিও হাসির গান রচনায় নাম করেন।

তার একটা নমুনা : কৃষ্ণ আছেন মথুরায় রাজা হয়ে। বৃন্দা গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেউড়িতে রাজার দারোয়ান তাঁকে আটকেছে। বৃন্দা তখন বলছেন :

লেট্ মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী,
এসেছি ব্রজ হতে আমি ব্রজের ব্রজনারী।
বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট
আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড
ফর্ হুম আওয়ার রাধে ডেড্ আমি তারে সার্চ করি।
মরাল্ ক্যারেকটার শুন্ ওর, বাটার থিফ্ ননীচোর
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর চোর, মথুরার দণ্ডধারী।
রাখাল ভূপাল কপাল ভারি।
কহে আর্ সি ডি বার্ডকিং ব্ল্যাক ননসেন্স ভেরি কানিং
ফ্লুটেতে করে সিং মজায়েছে রাই কিশোরী
কুলনাশা বাঁশি করে করি॥

রূপচাঁদপক্ষীর রচিত সেকেলে কলকাতার একটি উৎকৃষ্ট কৌতুকজনক বর্ণনাত্মক কবিতা পাওয়া যায়।

পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দে ও ভাবে কবিতাতে যুগান্তর আনলেন। তিনি রামায়ণের মেঘনাদবধের ঘটনা অবলম্বন করে যে কাব্য

লিখলেন সেই কাব্য প্রকাশিত হবার পর দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। কারণ আমাদের দেশে এ-পর্যন্ত সাহিত্যে যে-ভাব আর যে-ছন্দ চলে আসছিল, তা অধিকাংশ পুরোনো ধরনের। অর্থাৎ পয়ারের মতো ছন্দে আর সংস্কৃত কাব্যের আদর্শেই লেখা। মধুসূদন য়ুরোপীয় কাব্যের ভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে দু-একটা কবিতা যদিচ কালীসিংহ লেখেন, তবু মধুসূদনকেই এই ছন্দের প্রবর্তক বলা হয়। পয়ার কবিতার দুই দুই পংক্তির শেষের অক্ষরে মিল থাকে। অমিত্রাক্ষরে তা থাকে না। কিন্তু এই মিলের অভাবটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান লক্ষণ নয়। মিত্রাক্ষরে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি ক'রে পূর্ণ যতি থাকে; সুতরাং একেক পংক্তিতে একেকটি ভাব প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে পংক্তির অন্তে বা মধ্যে যে-কোনো স্থানে পূর্ণ যতি স্থাপিত হোতে পারে; সুতরাং একেকটি ভাব একেকটি পংক্তিতে সমাপ্ত না হয়ে একাধিক পংক্তিতে প্রবাহিত হয় চলে। এটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল লক্ষণ। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পংক্তিলঙ্ঘক বা প্রবহমান পয়ার নামে অভিহিত করা যায়। এই নামটাই উক্ত ছন্দের মূল প্রকৃতির পরিচায়ক। দুটি উদাহরণ দিলেই এটা সহজে বোঝা যাবে। যথা:

মিত্রাক্ষর

সুরনদী ধারা বহে হিমাচল পুরে।
সেই তটে তপ করে মঙ্গল অসুরে।
ষট্ ঋতু সমান পবন মন্দগতি।
নিশি দিন তপ করে নাই অন্যমতি।

অমিত্রাক্ষর

কহিলা সৌমিত্রি শূর শির নায়াইয়া
ভ্রাতৃপদে, কেন আর ডরিব রাক্ষসে।
রঘুপতি, সুরনাথ সহায় যাহার
কী ভয় তাহার প্রভু এ ভবমণ্ডলে।

এই রকম লেখাকে কেউ বা করল নিন্দে আর কেউবা করল প্রশংসা। সত্যকথা এই যে, যদিচ মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্যে অনেক দোষ আছে তবু বীররসের বর্ণনায় ও শব্দের আড়ম্বরে এই বইখানি এখনো অদ্বিতীয়।

মেঘনাদবধের ভাষা কঠিন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরল ভাষায় মাইকেলের অনুকরণে বৃত্রসংহার কাব্য লিখলেন। কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে সেখানি মেঘনাদবধ থেকে অনেক নিকৃষ্ট।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছোটো বড়ো কাব্য লিখে যশোলাভ করে গেছেন। এর পরে নতুন নতুন কবিরা নতুন ভাবে নতুন ছন্দে বাংলাভাষা ভরে দিলেন। শেষে এই ভাষা এমন হয়ে দাঁড়াল যে জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে গণ্য হোলো।

যাঁরা আজকাল কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন আর মাতৃভাষাকেও সমৃদ্ধিশালিনী করেছেন তাঁদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এঁদের কেউ কেউ নাটক উপন্যাস প্রভৃতিও লিখেছেন; কিন্তু কবিতাতেই এঁরা খ্যাত। আধুনিক কালে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রখর আলোকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল সাহিত্যিক জ্যোতিষ্কগুলির দীপ্তি ম্লান বোধ হয় কিন্তু ভবিষ্যৎকালের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বোঝা যাবে এঁদের প্রতিভাও সামান্য নয়; রবিমণ্ডলভুক্ত হওয়াতেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত ম্লান ব'লে প্রতীয়মান হয়েছে।

রবীন্দ্র-যুগের প্রথমভাগে যাঁরা কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ দাস ও রজনীকান্ত সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ সেনের গান জনপ্রিয়।

রবীন্দ্র-যুগের মধ্যভাগে যাঁরা কবিযশের অংশীদার বলে গণ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ছন্দ-প্রতিভার জন্যে; তিনি অনেক নূতন ছন্দ উদ্ভাবন ক'রে বঙ্গভারতীকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর সহকর্মীরা এখনো বঙ্গবাণীর সেবায় নিরত আছেন। এই যুগের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উভয়ের রচনাতেই একেকটি বিশিষ্ট সুর ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্র-যুগের শেষভাগে যাঁরা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, বর্তমান কালের নৈকট্য-বশত তাঁদের কবিপ্রতিভার যথোচিত মূল্য নির্ণয় এখন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতের দূরত্ব থেকেই তা সম্ভব। তথাপি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক কবিরা সংখ্যায়ও নগণ্য নন এবং তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণাও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। কিন্তু এস্থলে এঁদের রচনা-বৈশিষ্ট্যের আংশিক আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তবু গ্রন্থের পূর্ণতার খাতিরে কয়েকটিমাত্র নামের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ বিশি, বিষ্ণু দে প্রভৃতি অনেকেই নিজ নিজ বিশিষ্টতার জন্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। কাজি নজরুল ইসলামের কবিতায় অসাধারণ উদ্দীপনা পাঠকের মনে ফুটে ওঠে। এঁর গানগুলি জনপ্রিয়। জসিমউদ্দিন প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে

বাঙালির দেশের ও মনের অনিন্দ্য সুন্দর ছবিগুলি ভাষার গৌরবের সামগ্রী।

বাংলাকাব্যলক্ষ্মীর অর্চনায় বাংলার নারীরাও পিছিয়ে থাকেননি। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারানী দেবী প্রমুখ মহিলা কবিরা বাংলার সাহিত্যমন্দিরে যে দীপমালা জেলেছেন তা পুরুষদের তুলনায় নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়।

বাংলাকবিতার বই এখন যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি বাংলাছন্দের সংখ্যাও যাচ্ছে বেড়ে। তাছাড়া গদ্যের মধ্যে পদ্যের রসভোগ করবার ঝোঁক অনেক কাল আগে থেকেই কবিদের ছিল। যার ফলে সংস্কৃত-ভাষায় 'বৃত্তগন্ধি' গদ্যের উৎপত্তি। 'বৃত্তগন্ধি' মানে যাতে কবিতার ছন্দের গন্ধ পাওয়া যায়।

বাংলাভাষায় গদ্যছন্দের প্রচলন সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন। য়ুরোপীয় ভাষায় অবশ্য অনেকদিন থেকে পদ্যজাতের গদ্য আছে। একটা কথা কিন্তু অবশ্য মনে রাখা চাই যে, যে-কোনো গদ্যকে কেটে কেটে পদ্যের মতো করে সাজালেই গদ্যছন্দ হয় না। এতে রীতিমতো মাত্রার মাপ, আর চলন-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষত এই গদ্যছন্দ নতুন বলে অনেকেই ঠিকমতো পড়তে অভ্যস্ত নন। আবার কবি যদি ছন্দে পাকা না হন তবে লিখতেও গোলমাল করে ফেলেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘটেও তাই। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের উদাহরণ :

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মরঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হোলো ফসলখেতের জীবনীরচনা
মাঠে মাঠে কচিধানের চিকন অঙ্কুরে।
এমন সে প্রচুর, এমন সে পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,

দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে
তার পরিচয় এমন উদার প্রসারিত—
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে
তাকে কুলাতে পারে,
তার অপরিমেয় শ্যামলতায়
আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে ॥

যাত্রা, থিয়েটার ও অপেরা

আমাদের ভাষায় প্রাচীন নাটকের যা খবর পাওয়া যায় তার সংখ্যা বেশি নয়। রামায়ণ, মহাভারত অথবা কোনো পৌরাণিক বইয়ের ঘটনা অবলম্বন করে অভিনয় করা হোত। পরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ের অভিনয় চলে।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যারা অভিনয় করে তাদের বলা হয় কুশীলব। এই কথাটা আধুনিক লেখকগণও ব্যবহার করেছেন। এই কুশীলব শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে একজন কুশ আর একজন লব সেজে রামায়ণের পালা ভাবভঙ্গির সঙ্গে গাইত। সেই ভাবভঙ্গির সঙ্গে গানই ক্রমে ক্রমে অভিনয়ে পরিণত হয়েছে। আর অভিনেতাদের নাম সেই হতে কুশীলবই থেকে গেছে।

নেপালের রাজার পুস্তকালয়ে খানচারপাঁচ বাংলা পুরানো নাটক পাওয়া গেছে, এ কথা আগে বলা হয়েছে। এই নাটকগুলিতে গদ্যে কথাবার্তা প্রায় নেই। ছোটো ছোটো গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে।

সেকালে ছাপানোর যন্ত্র না থাকায় প্রোগ্রাম ছিল না। কাজেই লোকের বুঝবার সুবিধার জন্যে যারা অভিনয় করত তারা নিজের পরিচয় নিজেই অথবা অন্যকে দিয়ে দিত। (এই রীতি উড়িষ্যার

কোনো কোনো জায়গায় যাত্রার অভিনয়ে এখনো প্রচলিত রয়েছে)। যেমন— বিরাট রাজা আসরে এলেন, এসেই তিনি গান ধরলেন :

বিরাট নৃপতি হয়ে অমর সমান,
সুদর্শনা প্রিয়া মোর রতিসম জান।
সচিব নীতিবর্মা বিচারয় জান। ইত্যাদি।

পরবর্তী কালে পরিচয় দেওয়ার রীতি উঠে যায়।

অভিনয়ে সাধারণ লোক মেতে ওঠে, কাজেই নানা জেলা থেকে কৃষ্ণযাত্রার দল দেখা দেয়। কেননা কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে সব রকম ভাবেরই অভিনয় করা চলে। এইসব অভিনয়ের দলের অর্থাৎ নাটুকে দলের মালিককে অধিকারী আর অভিনয়কে বলা হয় যাত্রা-অভিনয়।

যাত্রা মানে যাওয়া। উৎসবে নানালোক যেয়ে জড়ো হোত অথবা দেবতা বাইরে যেতেন। তার থেকে উৎসবের নাম হয়ে দাঁড়াল যাত্রা। যেমন রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি। এখন এইসব যাত্রা উপলক্ষ্যে সাধারণ লোককে আমোদ দেবার জন্যে অভিনয়ের অনুষ্ঠান করানো হোত। ক্রমে ক্রমে এই অভিনয়েরই নাম হয়ে গেল যাত্রা।

য়ুরোপীয় ধরনে স্টেজ বেঁধে, সিন্ খাটিয়ে অভিনয় করাকে বলে থিয়েটার। আর যে-অভিনয়ে খালি নাচগানই বেশি তা হোলো অপেরা, বাংলায় বলে গীতিনাট্য। গীতিনাট্য, স্টেজে আর খোলা জায়গায়, উভয়ত্রই অভিনীত হোতে পারে। গীতিনাট্যের ভেতর হাসি-খুশি ও রঙ্গরহস্যের অধিকারই বেশি।

একশো বছর আগে এইচ লেবেডফ নামে একজন রাশিয়ান সব-প্রথম থিয়েটার আরম্ভ করেন কলকাতায়। থিয়েটারের নতুনত্বে বড়ো বড়ো লোক মেতে উঠলেন। কিন্তু যাত্রার অভিনয় হয় খোলা জায়গায়। আর থিয়েটারের অভিনয় হয় বাঁধা স্টেজে কাজেই এক রকম বই

দুই কাজে চালানো যায় না। সেজন্যে দরকার হোলো থিয়েটারের যোগ্য নতুন ধরনের বই লেখার। প্রথম প্রথম সংস্কৃতনাটকের থেকে অনুবাদ করে কাজ চালানো হোলো। কিন্তু তাতে থিয়েটার তেমন জমল না, পরে পুরস্কার ঘোষণা করে বই লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়। এতে অগ্রণী ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বাবুরা। লেখকদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন পুরস্কার পান— 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে নাটক লিখে। সেই নাটকের অভিনয়ও হয়। এইসব নাটক সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা আর সেগুলির ভাষাও তত মনোরঞ্জক নয়। তবু সেই অভাবের যুগে তা বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। শেষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কতগুলি নাটক ও প্রহসন লেখেন। নাটকে তিনি প্রথমটা সংস্কৃতের অনুসরণ করেন, কিন্তু পরে বাংলা নাটকে বিলাতী আদর্শ চালান। এগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তারপর নানাজনের চেষ্টায় থিয়েটার ক্রমে জাঁকিয়ে ওঠে। এই থিয়েটারকে অবলম্বন করে বইও রচিত হয়েছে বিস্তর।

বাংলানাটক যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনবন্ধু মিত্র অভিনয়ের বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন এনে দেশে একটা উৎসাহের সঞ্চার করে দেন। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে বাংলা-দেশের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বর্ণনা করেছেন, ঐ নাটকের অভিনয়ে দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। এমন কি, নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় লং সাহেবের জেল হয়।

এ পর্যন্ত যত নাট্যকার হয়েছেন তার মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। তিনি যেমন লিখিয়ে তেমনই অভিনেতা ছিলেন। তাঁর বলিদান, প্রফুল্ল, জনা, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটক কলকাতাবাসীদের মন বিশেষ করে আকর্ষণ করেছিল।

অন্যান্য যশস্বী নাট্যকারদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু,

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে লোকের মনে স্বদেশীভাব জাগিয়ে তোলে। এঁর অনেক স্বদেশী গানও লোকের মুখে মুখে সর্বত্র শোনা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান আর প্রহসনগুলিও খুব জনপ্রিয়। বর্তমানকালে মন্মথ রায়, প্রমথনাথ বিশি, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত যশস্বী নাট্যকার বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখকেরা যেমন অসংখ্য বই রচনা ক'রে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ভরিয়ে তুলেছেন, তেমনি আবার যাত্রার উপযুক্ত বইও অনেকে লিখেছেন। সেগুলির সংখ্যা নেহাত কম নয়, বাংলাদেশের সর্বত্রই যাত্রাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ঐ সব রচনা লোকের মনে আজও অজস্র রস সঞ্চার করে যাচ্ছে। এই ধরনের সাহিত্যলেখকদের মধ্যে অঘোর কাব্যতীর্থ, ধনকৃষ্ণ সেন, ধর্মদাস রায়, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রচনাতে খ্যাতি লাভ করেছেন।

দুঃখের বিষয় কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে বাংলার আধুনিক লেখকেরা যেরকম শক্তি দেখাচ্ছেন নাটকে তা পারছেন না। আধুনিক নাটক যেন সিনেমার অনুবাদ। নাটকীয় প্রতিভা ক্রমেই বাংলাসাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

উপন্যাস ও গল্প

বর্তমানে উপন্যাসই বাংলাসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যত বই প্রতিবছর বাংলা-ভাষাতে বেরুচ্ছে, তার ফর্দের দিকে তাকালেই এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ-দেড়েক বছর আগেও বাংলাসাহিত্যে গদ্যের তেমন চলন ছিল

না। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের কী রকম শ্রী ফিরে গেছে তা আলোচনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মিশনারিদের আমলে তৈরী পাঠ্যপুস্তকগুলিতে গল্পগুজব থাকলেও তা উপন্যাস বা গল্প শ্রেণীতে গণ্য হোতে পারে না। এর একটা প্রধান কারণ এই, সেগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া; আর উপন্যাস ও গল্পের উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দেওয়া। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল,' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা,' প্রভৃতি দু-একখানা বইকে আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও গল্পের আদিরূপ বলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া বিজয়বসন্ত, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, গোলেবকাওয়ালী, রবিন্সনক্রুশো, বঙ্গাধিপ-পরাজয় প্রভৃতি খানকতক বই সেকালে প্রচলিত ছিল।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য প্রতিভাবলে বাংলা-উপন্যাস আরোহণ করল উন্নতির চরম সোপানে। বঙ্কিমবাবু বাংলা উপন্যাস ও প্রবন্ধে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করে দিলেন। তাঁর সাহিত্যিক শিষ্যপ্রশিষ্যদের হাতে আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য রূপান্তর গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এই যুগে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বাংলাসাহিত্যে পড়ে। সেই প্রভাবে বাংলাসাহিত্য সতেজ ও সবল হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত উপন্যাসগুলি আধুনিক কালেও রস-মাধুর্য হারায়নি, এখনও ওগুলি পাঠ ক'রে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। এসময় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (উপন্যাস) ও দুর্গাচরণ রায়ের দেবগণের মর্ত্যে আগমন (ভ্রমণকাহিনী) নামে বই দুখানি পাঠকসমাজের প্রশংসা লাভ করে। মোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা হোলেও রচনাগুণে কাব্যধর্মী। এজন্য জনপ্রিয়। যথাক্রমে

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নবযুগের সৃষ্টি করেছেন। এ দুজনের কথা পরে বলা যাবে। কথা-সাহিত্যের এই নূতন পর্যায়ে যাঁরা বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম বলা উচিত। প্রভাতকুমারের ছোটো গল্পগুলি আমাদের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ব'লে গণ্য হয়েছে। এই যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেন এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও স্মরণীয়। বর্তমান কালে কথা-সাহিত্য রচনা ক'রে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ নিজ নিজ বিশিষ্টতার দ্বারা পাঠকপাঠিকার চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। দেশ ও সমাজের অনেক বিষয় যা আমাদের এতদিন চোখ এড়িয়ে উপেক্ষিত হয়ে এসেছিল এঁদের অনেকের রচনার প্রভাবে সেগুলির ওপর পাঠকের দরদী দৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। এঁরা নিজ নিজ রচনার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারকে বিচিত্র সম্পদের অধিকারী করে তুলছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা বর্তমান কালের কাজ নয়।

চলতি নদীর স্রোতের ওপরে থেকে যেমন সমগ্র নদীটার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, তেমনি কোনো লেখকের পক্ষেই সমসাময়িক সাহিত্যের যথার্থ বিচার করা সম্ভবপর নয়।

কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে বাঙালি নারীর দানও আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীই

এ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক এবং তাঁর রচনাবলী রসগ্রাহীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তার পরে যাঁরা গল্প উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী ও আশালতা দেবীর নাম সাদরে উল্লেখযোগ্য।

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে— উপন্যাস আর গোয়েন্দাকাহিনী অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভের গল্প, আরো অনেক কিছুর মতো বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে।

রঙ্গ-রচনা

যা পড়লে মনটা বেশ হাস্যময় আনন্দে ভরে ওঠে তাই রঙ্গ-রচনা। শুধু লোক হাসাবার জন্যে সুরুচি কুরুচি ভেদাভেদ না রেখে যা-তা লেখা রঙ্গ-রচনা নয়। পুরোনো বাংলায় যে-সব রঙ্গ-রচনা আছে প্রায়ই তা একটু মোটা রকমের। অর্থাৎ ভালোয় মন্দোয় মিশানো।

দাশরথি রায়ের রচনাতে অনেক হাস্যরস আছে। অন্যান্য পাঁচালি বা কবিওয়ালাদের লেখাতেও রঙ্গ-রচনা আছে। কিন্তু সেগুলি নিছক রঙ্গের জন্য নয়। বর্তমান যুগে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু অনেক হাস্যরসের বই লিখেছেন। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রমথনাথ বিশি, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধ) শ্রেষ্ঠ রঙ্গরচনাকার। এঁদের রচনা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি আনন্দদায়ক।

গল্প উপন্যাস লেখার চেয়ে রঙ্গ-রচনা ঢের কঠিন। সকলে লিখতে পারে না। জোর ক'রে হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে রচনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই রচনা মনকে যথেষ্ট হালকা করে দেয় বলে পাঠক ভারি

স্বস্তি লাভ করে। কাজেই রঙ্গ-রচনা সকলেই পছন্দ করে। দুঃখের বিষয় বাংলায় অন্য বিষয়ের তুলনায় এই জাতীয় রচনা যৎসামান্য।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বাংলাসাহিত্যের একটা বিশেষ সম্পদ। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনীষিগণ এত ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন যে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সহজ নয়। তবে যাঁদের বই সকলের কাছে আদর পাচ্ছে তাঁদের নামের তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বাংলাসাহিত্যের এই বিভাগটি নিঃসম্পদ নয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ মনীষীরা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সূচনা করেন। তাঁদের প্রবন্ধ-সম্ভারে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রথম যুগে বাঙালির চিত্ত বহু বিচিত্র বিষয়ের চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই মনীষিসঙ্ঘের মধ্যমণি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই বলিষ্ঠ মনের চিন্তা এবং সরস ও সবল রচনার স্পর্শে বাংলাদেশের জনচিত্তে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার উদ্‌বোধন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যাঁরা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার বাংলায় ঐতিহাসিক চর্চার একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক রচনার অন্যতম প্রথম প্রবর্তক বলে খ্যাত হয়েছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানব্রতী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে অনন্যতা অর্জন করেছেন তার সম্যক্ আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে এটুকু বলা

প্রয়োজন যে তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বহু বিভাগই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর সরস ও সবল অথচ অতি সরল রচনাভঙ্গির গুণে দর্শন-বিজ্ঞানের দুরূহতম তত্ত্বগুলিও অবলীলাক্রমে সাধারণ পাঠকেরও অনায়াসবোধ্য হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধ-সাহিত্যের আসরে সগৌরবে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই বাংলায় এক স্বর্ণযুগের উদ্‌বোধন ঘটল। কত বিচিত্র যে তাঁর বিষয়বস্তু, কত অজস্র তাঁর গদ্য রচনার ধারা ও কত অপরূপ তাঁর প্রকাশভঙ্গি, তা এই সামান্য পুস্তকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য কবিপ্রতিভাই আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে রেখেছে, তাই তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের যথোচিত মর্যাদা অজ্ঞাত। কিন্তু বস্তুত তাঁর প্রবন্ধাবলির যথার্থ গৌরব তাঁর কাব্য-সাহিত্যের চেয়ে ন্যূন নয়। তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। বাংলার আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করবার পক্ষে প্রমথবাবু আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। এই আন্দোলন তিনি চালিয়েছিলেন 'সবুজপত্র' নামে সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্রে। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে অনেকেই চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন বলে স্বীকার করেছেন। এটাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিশেষ কৃতিত্ব ও সাফল্য। বর্তমানে সমালোচনা ক্ষেত্রে সজনীকান্ত দাসের নাম বহুবিশ্রুত।

শিশুসাহিত্য

বয়স্ক লোকের মনের খোরাক জোগানোর লোকের অভাব নেই। কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেদের মনের খোরাক জোগানোর লোক কম। কাজটাও সোজা নয়। পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ছেলেদের

মন বছরে বছরে বদলে যায়। কাজেই পাঁচ বছরের ছেলের যে ধরনের বই চাই সাত বছরের ছেলের জন্য তাতে হয় না, অন্য ধরনের বই দরকার।

বয়স আর বুদ্ধির ক্রম অনুসারে ছেলেদের জন্য বই লেখা বেশ কঠিন কাজ। কিছুকাল আগে তো শিশুদের বইই ছিল না। গত ত্রিশ চল্লিশ বছর থেকে শিশুসাহিত্য দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরো বাড়বে, আরো সুন্দর হবে ও যথাযোগ্যভাবে বাংলাভাষাকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুকুমার রায়, জগদানন্দ রায় শিশুদের জন্যে বিবিধ বিষয়ে ও বৈজ্ঞানিক বই লিখে বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কুলদারঞ্জন রায় ও সুখলতা রাও, সুনির্মল বসু, সুবিনয় রায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এ বিষয়ে।

বর্তমানে অন্যান্য লেখকদেরও লেখা শিশুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

অনুবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যের নানা দিকের মধ্যে অনুবাদেরও স্থান বড়ো। কেউ কেউ মনে করেন অনুবাদের দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করা ক্ষীণতার লক্ষণ। একথা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা অন্যান্য দেশের মনীষিদের চিন্তা অনুবাদের ভেতর দিয়ে ঘরোয়া হয়ে ওঠে। নিজের ভাষার ভেতর দিয়ে যদি অন্য ভাষার সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তবে সেটা গৌরবেরই কথা। অবশ্য কাব্য কবিতার রস অনুবাদে ঠিকমতো ধরা পড়ে না কিন্তু দেশ, সমাজ আচার বিচার বিজ্ঞানের নানাশাখা চিকিৎসা গণিত প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদে কিছু হানি ঘটে না, বরঞ্চ

বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদে নতুন নতুন শব্দগঠনের দ্বারা ভাষার শব্দসম্পদ বাড়ে আর দেশের অনেক লোকে রুচিমতো তা পড়তেও পারে। দেখা যাচ্ছে ইংরাজি অনুবাদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর হেন দেশের হেন বিষয় নেই যা না জানা যায়। অথচ এই অনুবাদ বিপুলতার জন্যে ইংরেজির নিজস্ব গৌরব কিছুমাত্র কমেনি।

বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য অতি অকিঞ্চিৎকর। বিদেশি বইয়ের তো কথাই নেই। এই ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকের ভালো ভালো বইয়েরও বাংলা অনুবাদ নেই। তাদের খবরও আমরা জানিনে। এটা আমাদের একদিক দিয়ে দুর্বলতার লক্ষণ।

অনেকগুলি হিন্দু মুসলমান ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থের ভালো অনুবাদ বেশি নেই। বিদেশী গল্প উপন্যাস কাব্য দর্শন প্রভৃতির কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে। কোনো একটি সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভালো অনুবাদক দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত নামকরা বইগুলির বাংলা অনুবাদ হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বাংলাতে সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হয়েছে সংস্কৃত বইয়ের। এজন্য মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রমুখ অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলী দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

বিবিধ

বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, রাজনীতি, সংগীত, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাংলাভাষায় বই লেখা আরম্ভ হয়েছে, দেশবিদেশের ভালো ভালো বইয়ের অল্পবিস্তর অনুবাদও হচ্ছে। আশা করা যায় যে, অবিলম্বে এমন একদিন আসবে যখন কোনো বিষয় জানবার জন্যে আর আমাদের অন্য ভাষার মুখাপেক্ষী হোতে হবে না।

আর-একটা কথা এখানে বলা উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে শিক্ষিত মুসলমান কবিগণ বিভিন্ন সময়ে আরবি ফারসি গল্পের ও ধর্ম-পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি করে গিয়েছেন। সেগুলির সংখ্যাও কম নয়। এই বইগুলি কিন্তু উল্‌টোদিক থেকে ছাপা। অর্থাৎ আমাদের পাঠ্য-প্রভৃতি বইগুলি যে পাতায় শেষ হয়েছে, এ সব বইয়ের আরম্ভ সেই পাতা থেকে। আরবি ফারসি অক্ষর লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁদিকে, সে-সব অক্ষরে এ ভাবে ছাপানো মানায়, কিন্তু বাঁদিক থেকে লেখ্য বাংলা অক্ষরে এরকম করে উল্‌টো ছাপানোর কোনো মানে হয় না।

স্বদেশী আন্দোলন, ও দেশের মহাপুরুষদের অবলম্বন করে বিভিন্ন ধারায় বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর ওতপ্রোত। কাজেই সাহিত্যের গতির ওপর পূর্বাপর লক্ষ্য রাখতে গেলেই সমাজ ও ধর্মের অল্পবিস্তর আলোচনা আপনিই এসে পড়ে। সেদিক দিয়ে জ্ঞানের পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একাল, 'ম' কথিত— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, এনামুল হকের বঙ্গে সুফী প্রভাব এই চারখানি বই বিশেষ মূল্যবান।

বাংলাসাহিত্যের উন্নতির জন্যে দেশের বড়ো বড়ো লোকেরা বাংলা ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ নামে একটি সমিতি স্থাপনা করেন। কেননা শুধু ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো সাহিত্যের সম্যক্ বিকাশ সম্ভব নয়। এই সমিতি থেকে নানাবিধ পুরোনো ও নতুন বই প্রকাশিত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই পরিষদের শাখা আছে। প্রতিবৎসর এক এক জায়গায় বাংলার সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত হন, এসব সম্মিলনে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহের আলোচনা হয়। এই পরিষদ্ থেকে একখানি পত্রিকাও বের হয় তাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকে। কলকাতায়

সাহিত্যপরিষদের নিজস্ব একটি বড়ো বাড়ি আছে, সেখানে অনেক পুরানো বই, মূর্তি ও ছবি প্রভৃতি সংগৃহীত হচ্ছে।

বাংলার সাময়িকপত্রের স্থানও উচ্চে। বাংলাভাষার প্রথম সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, বাংলাগেজেটি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ কৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকা সেকালে অর্থাৎ একশো বছর আগে প্রচলিত ছিল।

পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার বহুল প্রচার হয়। ক্রমে ক্রমে হিতবাদী, বসুমতী, সঞ্জীবনীর অভ্যুত্থান ঘটে। বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতীর পরিচালকগণ বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ আর খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাবলী সহজে বাঙালি পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাধারণের পক্ষে জ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দিয়েছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে সাহিত্য পরিষদ্ থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি মুদ্রিত হচ্ছে। শিক্ষিত বাঙালি এঁদের নিকট ঋণী, একথা মানতে হবে। বটতলার গ্রন্থপ্রকাশকগণও অনেক পুরানো বাংলা বই ছাপিয়ে সেগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, এক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের স্মরণীয়। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা সবচেয়ে জনপ্রিয়।

মাসিক পত্রিকার মধ্যে সেকালে বিবিধার্থসংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, বালক, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি চলত, আজকাল প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বসুমতী, মোহাম্মদী বেশি প্রচলিত পত্রিকা। এ ছাড়া স্বল্পজীবী সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। প্রতি বৎসরই বহু নতুন নতুন কাগজ বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো বেরচ্ছে এবং অচির কালের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এগুলির সংখ্যাও কম নয়।

জীবিত লোকের জীবনচরিত যেমন সম্পূর্ণ লেখা যায় না, তেমনি জীবিত ভাষায় কাহিনীও শেষ করা যায় না। কেবল অতীত আর

বর্তমানের খানিকটা নিয়ে কিছু বলা চলে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে, সেই অনুপাতে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে তার ভাবী বিকাশ ও পরিণাম সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়।

কয়েক বছর থেকে আবার সমস্ত জগতের সভ্যসমাজে চিন্তা ও ব্যবহারের ধারা দ্রুত বদলে আসছে। সমাজের প্রতিচ্ছবি হোলো সাহিত্য, সুতরাং সাহিত্যেরও যে বিষয় আর ভাব বদলাবে সে-কথা বলা বাহুল্য। আগেকার সাহিত্যের একটি মূল ইঙ্গিত ছিল যে, ভালোর ফল ভালো, আর মন্দের ফল মন্দ। এই ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে সাহিত্যের রূপ একতরফা হয়ে থাকত।

যাকে বাইরে ভালো দেখছি সে হয়তো ভিতরে তার উলটো, আবার যাকে মন্দ বলেই জানি সে ভেতরে নিতান্ত নির্দোষ। সমাজের চাপে বৈধঅবৈধের বিচারে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভেতরকার স্বরূপের সত্য থাকে চাপা। সেইটেই অজকালকার সাহিত্যে (পদ্য ও গদ্যে) ফুটিয়ে দেখানো হয়। এতে করে বিষয় হয়ে ওঠে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রাশীয়ান ও ফরাসী লেখকরাই এই-ভাবের সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 'পথিকৃৎ'। বাংলায় এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন একদল লেখক দেখা দিয়েছেন। এই অতিআধুনিক-ভাবের, সাহিত্যকে হেলায়-শ্রদ্ধায় "তরুণ সাহিত্য" বলা হয়। অবশ্য—তরুণবয়স্ক লেখকের লেখা বলে নয় কেননা প্রাচীনলেখকেও তা লিখছেন, ভাব তরুণ বলেই ঐ নাম। জনসাধারণের ভেতর এই সব লেখার অত্যন্ত চাহিদা। কিন্তু আবার অনেক নিষ্প্রতিভ লেখকও যশস্বী লেখকদের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ছেন এ-ক্ষেত্রে, নামের মোহে। যেমন দেশবিজয়ী বীরগণের পেছনে পেছনে চলে একদল অক্ষম দুর্বল কিছু সঞ্চয়ের আশায়।

এই নবোদীয়মান অতিআধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা রয়েছে দূর ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে— একথা আগে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

এতক্ষণ যে-সব আলোচনা করে আসা গেল তার ভেতর দুজন মনীষীর কথা বিশেষ কিছু বলা হয়নি। এঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবি আর চন্দ্র যেমন আকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার, তেমনি বাংলাসাহিত্য-আকাশের এঁরা।

এক এক সময় এক-এক জন মহাপুরুষ আসেন অপ্রতিম শক্তি নিয়ে— কেউবা ধর্মে, কেউবা কর্মে কেউবা রাজনীতিতে কেউবা সমাজ ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে। এঁদের প্রতিভা ও শক্তিতে জাতীয় জীবনের এক-এক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে আমাদেরই সময়ে সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তেমনি একজন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বারো তেরো বছর বয়স থেকেই ইনি কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যেদিকে ইনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বই না লিখেছেন। এঁর লেখা সাহিত্যের কথা খুঁটিয়ে বলতে গেলে 'বাঁশবনে ডোম কানা'র মতো অবস্থা হয়। গান ও কবিতার তো কথাই নেই। :উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, ছোটোগল্প, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে এঁর-লেখা বই অতুলনীয়। আশ্চর্যের বিষয়, এখন স্বদেশ, মাতৃভাষা আর অস্পৃশ্যতা নিয়ে যে-সব আন্দোলন চলছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার রবীন্দ্রনাথের বইয়ে তার সূচনা রয়েছে।

এসিয়াবাসীর মধ্যে ইনিই সবপ্রথম সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান।

সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে যিনি যখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হন তিনিই ঐ নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন। ইনি নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে সমস্ত দেশময় সাড়া পড়ে গেল। যে-বাংলাভাষা বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিল সেই বাংলা পৃথিবীর বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর পেল, স্থান পেল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান যে-বইখানির জন্যে সেখানি তাঁর দু-একখানি বাংলা বইয়েরই অনুবাদ। ইংরেজি বইখানির নাম দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি।

আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরই মাতৃভাষার বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকে এসম্বন্ধে লেখালেখি করেন। সুখের বিষয় সম্প্রতি বাংলাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বই না পড়লে আজকাল আমাদের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়; তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত না হোলে কোনো বাঙালিই এখন শিক্ষিত বলে গণ্য হন না।

শরৎচন্দ্র

এইবার শরৎচন্দ্রের কথা। এঁর লেখার ভেতর দিয়ে যেন সমগ্র বাংলাদেশ আর বাঙালির সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইজন্যে এঁর বই এত জনপ্রিয় যে, যে বাঙালি সামান্য লেখাপড়া জানে সেও এঁর বই দরদ দিয়ে পড়ে থাকে।

বর্তমানে উপন্যাসের ধারা এঁর প্রভাবে বদলে গিয়েছে, এমন কি শিক্ষিত লোকের চিন্তার গতি পর্যন্ত। বিশেষত বাংলার মেয়েদের আর সমাজের অন্তরের চিত্র এঁর লেখায় এত স্পষ্ট যে, তা পাঠককে অভিভূত করে ফেলে।

এতক্ষণ বাংলাসাহিত্যের সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলা গেল, আর বাকিও রইল অনেক কথা। বাংলার মাটি বাংলার ঋতু যেমন আমাদের দেহকে প্রতিনিয়ত পুষ্টি দান করছে, তেমনি বাংলার ভাষাও আমাদের মনকে শতদল পদ্মের মতো বিকশিত করে জগতের মাঝে আমাদের বরণীয় করে তুলছে। এইবার কবিগুরুর একটি কবিতা উচ্চারণ ক'রে আমাদের বক্তব্য শেষ করি :

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রসবন্যা বেগে,
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে,
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল, কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি পরে
অলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে।
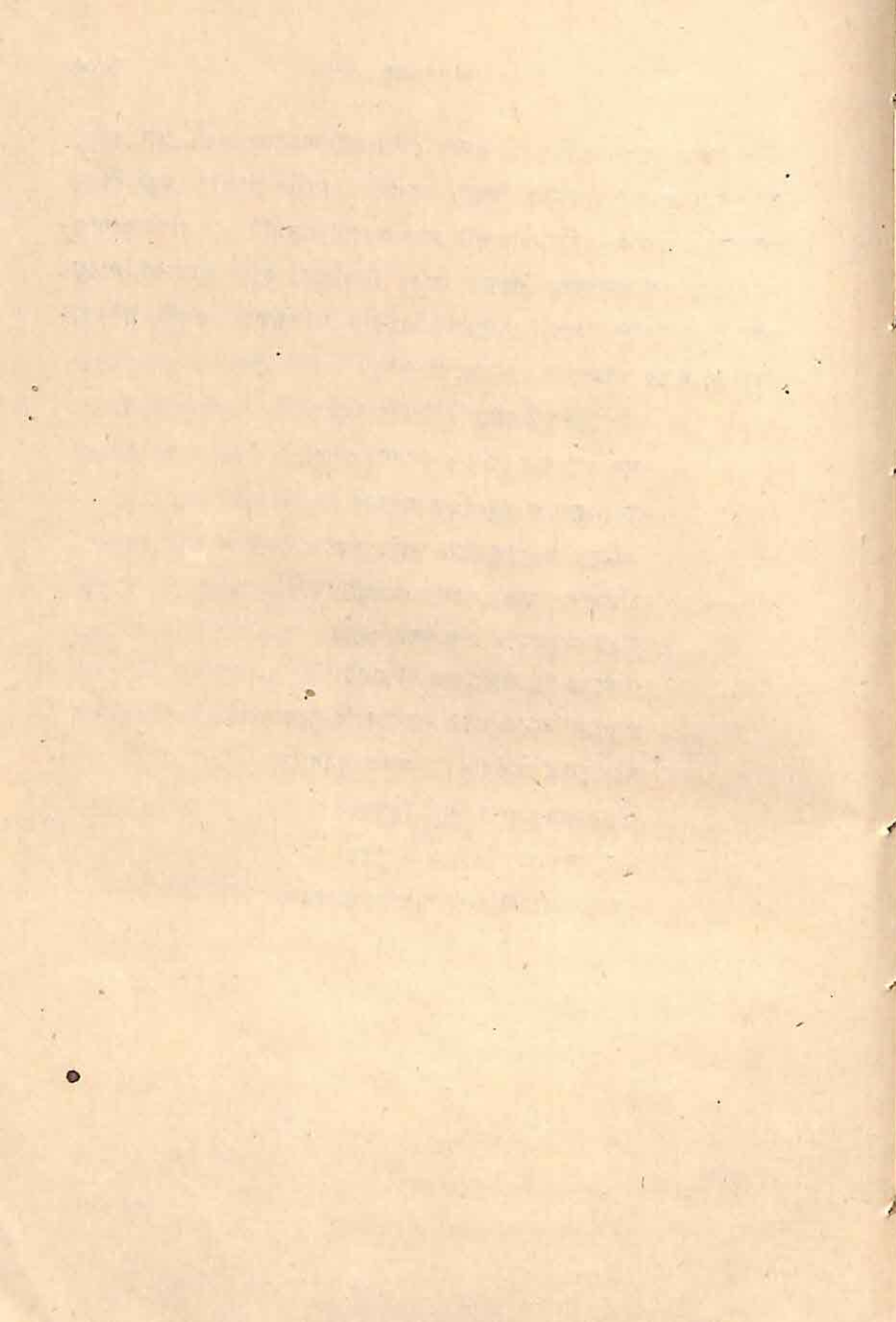
পরিশিষ্ট

কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ

আখেটী— শিকারী

আজ্ঞি— ভেতরে মশলা যাবার জন্যে সরুসরু করে চেরা।

আয়তি— সধবার চিহ্ন

আমানি— পান্তাভাতের জল

উছটি— পায়ের আঙুলের গহনা

একুশে— শিশুর জন্মের পর একুশদিনে করণীয় ষষ্ঠীপূজা

কাউঠা— কচ্ছপ

কাছুটি— কোমরবন্ধ

কালীদহ— সমুদ্রের মধ্যে একটি স্থান

কুজ— মঙ্গল (গ্রহ)

কোঁড়া— ছোট্ট চারা গাছ

খণ্ড— খাঁড়, গুড়

গটিয়া গাবর— গটিয়া—দৃঢ়শরীর, গাবর—নৌকার মাল্লা

গাড়র— ভেড়া

গাবী—গরু

ঘাঘর— ঘুঙুর

চ্যাংমুড়ি কানী— সিজের গাছ মনসার প্রিয় গাছ, যেমন শিবের বেলগাছ, বিষ্ণুর তুলসীগাছ। তৈলঙ্গী ভাষায় ঐ গাছের নাম চ্যাংমুড্ডু। বোধ হয় তার থেকে মনসার এই নাম। আবার চ্যাংমাছের মতো যার মুখ, এই অর্থেও চ্যাংমুড়ি বলা চলে। কানী— দুর্গা ঝগড়া ক'রে মনসার এক চোখ কানা করে দেন।

ছানি— পুরো কথা "ভোখছানি", ছন্দের জন্যে মাঝে "লাগে" কথাটা বসেছে। ভোখছানি মানে ক্ষুধায় অবসন্নতা।

জাউ— (যবাগূ) যব দিয়ে হালুয়ার মতো করে রাঁধা খাবার

জাত—যাত্রা, উৎসব

ঝারি—ঘটি

টঙি—জলের উপর বাঁধা মাচা

তলিত— ভাজামাংস

তেগুঁড়ি— তে—তিন, গুঁড়ি—গুটি, হাঁড়ি বসাবার জন্যে উনুনের ঝিঁকের মতো মাটির তৈরি তিনটে উঁচু গুটি।

দঢ়— (দৃঢ়) দক্ষ, পটু

নফর— চাকর

দেহালা— কচিছেলে স্বপ্নে কখনো হাসে কখনো কাঁদে। লোকে বলে তার সঙ্গে মা-ষষ্ঠী খেলা বা আলাপ করেন। দেব-খেলা বা দেবালাপ শব্দ থেকে দেহালা কথাটা এসেছে।

নেতের কাপড়— মিহি কাপড়। নৃত্য থেকে নেত শব্দ। নাচার সময় মিহি কাপড় পরা হয়। তা থেকে সাধারণ ভাবে মিহি কাপড়ের নাম হয়েছে নেতের কাপড়। সংস্কৃতে "নেত্র" নামেও একরকম কাপড়ের কথা আছে।

পাখী— (পচ্ছি) ছোটো ঝুড়ি অথবা থলে

পাটন— (পত্তন) নগর। বিশেষত নদী বা সমুদ্রের তীরবর্তী নগর।

ভরা— নৌকা

মধুকর— বাংলার সদাগরদের বাণিজ্যে যাওয়ার নৌকার নাম

রসবাস— মসলা

লোহ— জল

বাগুরা— জাল

বারি—যে ঘটে দেবতার পূজা হয় সেই ঘটের জল অথবা জলসুদ্ধ ঘট

বহিত্র— নৌকা

বুড়ি— ডুবি

হেঁদাল— (হিন্তাল) একরকম পাহাড়ে গাছ, যার গন্ধে সাপ ভয় পায়। হেঁদালের লাঠি কাছে থাকলে নাকি সাপ কাছে ঘেঁষে না।

কালানুক্রমণ

নিচের বৎসর সংখ্যাগুলি খ্রীস্টাব্দের। খ্রীস্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বছর বাদ দিলে মোটামুটি বাংলা সন পাওয়া যায়। * তারাচিহ্ন দেওয়া বছর আনুমানিক জীবৎকাল; ব্যক্তির নামের পর আগেকার সংখ্যা জন্মের, পরেরটা মৃত্যুর।

১. কবি ও লেখকদের জীবনকাল

কৃত্তিবাস— জন্ম-তারিখ খুব সম্ভবত ১৩৯৯, ১২ই জানুয়ারি; মৃত্যুতারিখ অজ্ঞাত। ১৪১৭-১৮ সালে গৌড়েশ্বরের দরবারে সম্মানলাভ।

চণ্ডীদাস— * ১৪৫০

চৈতন্যদেব— ১৪৮৬-১৫৩৪

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী— * ১৬০০

কাশীরাম দাস— * ১৬০০

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়— * ১৭১২-১৭৬০

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন— ?-১৭৭৫

রামরাম বসু— *১৭৫৭-১৮১৩

রামমোহন রায়— ১৭৭৪-১৮৩৩

উইলিয়ম কেরি— ১৭৬১-১৮৩৪

জীবনের শেষ ৪১ বৎসর বাংলায় বাস

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার— ১৭৬২-১৮১৯

রামমোহন রায়— * ১৭৭৪-১৮৩৩

দাশরথি রায়— ১৮০৪-১৮৫৭

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত— ১৮১১-১৮৫৯

প্যারীচাঁদ মিত্র— ১৮১৪-১৮৮৩

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮১৭-১৯০৫

মদনমোহন তর্কালংকার— ১৮১৭-১৮৫৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর— ১৮২০-১৮৯১

অক্ষয়কুমার দত্ত— ১২৮০-১৮৮৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন— ১৮২২-১৮৮৬

রাজেন্দ্রলাল মিত্র— ১৮২২-১৮৯১

মধুসূদন দত্ত—১৮২৪-১৮৭৩

ভূদেব মুখোপাধ্যায়— ১৮২৫-১৮৯৪

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮২৭-১৮৮৭

দীনবন্ধু মিত্র— ১৮২৯-১৮৭৩

বিহারীলাল চক্রবর্তী— ১৮৩৫-১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ১৮৩৮-১৮৯৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮৩৮-১৯০৩

কেশবচন্দ্র সেন— ১৮৩৮-১৮৮৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮৪০-১৯২৬

কালীপ্রসন্ন সিংহ— ১৮৪০-১৮৭০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ— ১৮৪৩-১৯১১

নবীনচন্দ্র সেন— ১৮৪৬-১৯০৯

রমেশচন্দ্র দত্ত— ১৮৪৮-১৯০৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৪৮-১৯২৫

অমৃতলাল বসু— ১৮৫৩-১৯২৯

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— ১৮৫৩-১৯৩২

স্বর্ণকুমারী দেবী— ১৮৫৫-১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮৬১-১৯৪১

স্বামী বিবেকানন্দ— ১৮৬৩-১৯০২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— ১৮৬৩-১৯১৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ১৮৬৬-১৯৩৮

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— ১৮৮২-১৯২২

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮৮৪-১৯৩০

২. কয়েকটি স্মরণীয় বৎসর

১৫১৭— পোর্তুগীজদের প্রথম বাংলায় আগমন।

১৬৭৪— পোর্তুগীজদের পাদ্রি দোম্ আন্তনিও-কর্তৃক 'ব্রাহ্মণ-রোমানকাথলিক সংবাদ' নামক প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা।

১৭৩৪— পোর্তুগীজ পাদ্রি মনোএল্‌দা আস্‌সুম্প্‌সাওঁ কর্তৃক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', নামক দ্বিতীয় বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা।

১৭৪৩— উক্ত গ্রন্থখানি পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়। এখানিই প্রথম মুদ্রিত বাংলাগ্রন্থ।

১৭৫২— অন্নদামঙ্গল-কাব্য রচনা।

১৭৫৭— পলাশির যুদ্ধ ও ইংরেজের জয়লাভ।

১৭৬৫— 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'-নামক ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলার দেওয়ানিলাভ ও ইংরেজ-প্রভুত্বের সূচনা। [১৬৫১ সালে ইংরেজদের প্রথম বাংলায় আগমন ও ১৬৯১ সালে তাঁদের বাংলায় বসবাসের আরম্ভ।]

১৭৭৮— চার্ল্‌স উইলকিন্‌স্ কর্তৃক সর্বপ্রথম বাংলা ছাপার হরফ

নির্মাণ ও হাল্‌হেড্‌-কৃত বাংলাব্যাকরণ মুদ্রণ: এটিই বাংলা লিপিতে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

১৭৯৯— শ্রীরামপুরে খ্রীস্টান মিশন প্রতিষ্ঠা।

১৮০০— ফোর্টউইলিয়ম কলেজ স্থাপন ও বাংলার অধ্যাপকপদে উইলিয়ম কেরির নিয়োগ।

১৮০১— রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' প্রকাশ; ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক ও বাঙালির লেখা বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বই।

১৮০৪— শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ-কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ।

১৮১৫— রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বেদান্তগ্রন্থ'।

১৮১৮— শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ; বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাংলা গেজেটি' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশ।

১৮৪৭— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

১৮৫৪— বিদ্যাসাগরকৃত 'শকুন্তলা' প্রকাশ এবং 'মাসিক পত্রিকা' নামক সাময়িক কাগজে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-এর 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাসের ক্রমশ প্রকাশ।

১৮৫৭— সিপাহি বিদ্রোহ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৮— 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৬০— মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশ; বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন।

১৮৬১— মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৬২— কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রকাশ।

১৮৬৫— বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ।

১৮৭২— বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ।

১৮৭৮— রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "কবিকাহিনী"।

১৮৯১— রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৯৩— বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা।

১৯০১— রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) প্রকাশ।

১৯১৩— রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯১৪— প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' প্রকাশ।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পাঁচ সিকা
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী — আট আনা
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত — পাঁচ সিকা
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য — এক টাকা
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর — দেড় টাকা
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী — পাঁচ সিকা
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — এক টাকা বারো আনা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না। এই অভাবপূরণের জন্য ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১৩৫০ ও ১৩৫১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থমালার তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠানো হইবে।